সাহিত্যতত্ত্ব: একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা

মুহম্মদ মুহসিন

[এই পরিক্রমায় বিধৃত আলোচনাগুলো পুরোপুরি মৌলিকভাবে আমার নয়। এ আলোচনার সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, কানপুর- এর ডিপার্টমেন্ট অব হিউম্যানিটিজ এ্যান্ড সোশাল সাইন্সেস- এর শিক্ষক সায়ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সাহিত্যতত্ত্বের ওপর প্রদত্ত লেকচার সিরিজের প্রতি। এছাড়া যে সকল পুস্তকের প্রতি সরাসরি ঋণ স্বীকার করছি তাদের মধ্যে রয়েছে প্রমোদ কে. নায়ারের 'কন্টেম্পোরারি লিটারারি এন্ড কালচারাল থিয়রি', পিটার বেরির 'বিগিনিং থিয়রি', সাইমন মালপাস সম্পাদিত 'দি রুতলেজ কম্প্যানিয়ন টু ক্রিটিকাল থিয়রি', লোইস টাইসনের 'ক্রিটিকাল থিয়রি টুডে' এবং খোন্দকার আশরাফ হোসেনের 'বাঙালির দ্বিধা ও রবীন্দ্রনাথ এবং বিবিধ তত্ত্বতালাশ'। এই পরিক্রমা সাহিত্যতত্ত্বে শুধু হাতেখড়ি দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত। এটি মোটেই কোনো একাডেমিকভাবে উদ্ধৃতিযোগ্য আলোচনা নয়। তাই সাধারণ একাডেমিক রীতিতে এখানে তথ্যসূত্র উল্লিখিত হয়নি বিধায় শুরুতে সার্বিকভাবে এই ঋণ স্বীকার করা হলো।]

সাহিত্যতত্ত্বের কোনো বৈশ্বিক ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। এ সম্পর্কে চলনসই একটি ধারণা পেতে হলে আমরা চেষ্টা করতে পারি এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এক সুতায় গেঁথে একটি পরিচিতি দাঁড় করাতে। পরিচয়ের চেষ্টাটা আভিধানিক বিশ্লেষণ থেকে শুরু করা যাক। আভিধানিকভাবে তত্ত্ব হলো কোনো অধ্যয়নযোগ্য বিষয়ের ধারণাগত ভিত্তি (the conceptual basis of a subject or an area of study)। বিষয়টি ধারণাগত কারণ এটি ব্যবহারিক চর্চার বিপরীতে দাঁড় করানো। বিষয়টি ধারণাগত মানে হলো বিপরীতে এর একটি অনুশীলন বা চর্চাগত দিক রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় সাহিত্যতত্ত্ব হলো সাহিত্য হিসেবে আমরা যা অধ্যয়ন করি তার ধারণাগত দিক। এর উল্টোদিকে রয়েছে উক্ত ধারণাসমূহের চর্চাগত দিক যার মাধ্যমে সাধিত হয় সাহিত্যের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ। ব্যাপারগুলো এক সুতায় গেঁথে এভাবে বলা যায় যে, সাহিত্যতত্ত্ব হলো সাহিত্য বিষয়ক সেই সকল ধারণা যা সাহিত্যের ওপর প্রয়োগ করলে সৃষ্টি হয় সাহিত্য সমালোচনা। অর্থাৎ সাহিত্যতত্ত্বের ব্যবহারিক দিক হলো সাহিত্যসমালোচনা। সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যের গঠন ও প্রকৃতির সামগ্রিক ধারণা দেয়। পক্ষান্তরে সাহিত্য সমালোচনা সেই গঠন ও প্রকৃতির বিমূর্ত ধারণা থেকে মূর্ত কৌশল বের করে এনে তা দ্বারা সাহিত্যের নির্দিষ্ট এক একটি টেক্সটকে ব্যবচ্ছেদ করে।

এই পরিচয় অবশ্য একশোভাগ নির্ভরযোগ্য নয়। এর দৃশ্যমান অনির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ হলো আমরা যাঁদেরকে সাহিত্যতত্ত্বের গুরু হিসেবে পাঠ করি তাঁদের বেশিরভাগই সাহিত্যের সমালোচক ছিলেন না এবং তাঁদের উদ্ভাবিত ঐ সব ধারণা সাহিত্য মূল্যায়নে ব্যবহৃত হতে যাবে এমনটা তাঁরা ভাবেনওনি। জ্যাক দেরিদা বর্তমান সাহিত্যতত্ত্বে এক অবশ্য পাঠ্য নাম। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন দর্শনের অধ্যাপক। একইভাবে আজকের নমস্য সাহিত্যতাত্ত্বিক জ্যাক লাকাঁ ছিলেন একজন মনোচিকিৎসক। স্ট্রাকচারালিজমের যাঁকে জনক বলা যায় সেই ক্লদ লেভি স্ট্রসের ক্ষেত্রও সাহিত্য ছিল না, ছিল সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত নৃবিজ্ঞান। এসব দৃষ্টান্তের দিকে তাকিয়ে এ কথা বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, আজ সাহিত্য বীক্ষণের যে তত্ত্বসমূহ দাঁড়িয়েছে তার বেশিরভাগই সাহিত্য বিষয়ক ধারণার জগতে জন্ম নিয়েছিল না, বরং জন্ম নিয়েছিল অন্যত্র। সেগুলো জন্ম নিয়েছিল সমাজবিজ্ঞানে, মনোবিজ্ঞানে, দর্শনে, ইতিহাসে এবং এমনসব অসাহিত্যিক ক্ষেত্রে। এসব দেখে আমেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জোনাথান কালার বলেছেন 'সাহিত্যতত্ত্ব' শব্দটিই ভুল। শব্দটি হবে শুধু 'তত্ত্ব', 'সাহিত্যতত্ত্ব' নয়। কারণ, এই 'তত্ত্ব'গুলো মূলত সাহিত্যজগতের তত্ত্ব নয়, বরং অন্যসব জগতের তত্ত্ব। তাঁর 'লিটারারি থিয়রি: এ শর্ট ইন্ট্রোডাকশন' গ্রন্থে তিনি একটু রাগতভাবেই বলেছেন যে, সাহিত্যতত্ত্ব নামক এই বস্তুগুলো এই দুনিয়ার যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু এগুলো কখনোই সাহিত্যের গঠন বা তার পাঠকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না।

সাহিত্যতত্ত্বের আগাগোড়া ইতিহাস অবশ্য এমনটা না। ১৯৬০ এর দশকের আগে পুরো ইতিহাস জুড়ে সাধারণত এই তত্ত্বের বিষয়াদি সাহিত্যের আঙ্গিনায়ই বড় হয়েছে। ১৯৬০ এর দশক আর তারপর থেকেই মূলত সাহিত্যের তত্ত্ব সাহিত্যের বাইরের জগতের তত্ত্বের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। তবে একদল আছেন তাঁরা মনেই করতে চান না যে ১৯৬০ এর দশকের আগে সাহিত্যতত্ত্ব বলতে কিছু ছিল। তাঁরা বলতে চান আমরা আজ যাকে সাহিত্যতত্ত্ব বলতে বুঝি দুনিয়ায় তার জন্মই হয়েছে ১৯৬০ এর দশকে। তাঁরা আরো স্পষ্ট করে বলতে চান যে, এর জন্মসাল মোটামুটি ১৯৬০ এর দশক, আর এর জন্মস্থান ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের পার্শ্ববর্তী এলাকা। এর জন্মস্থান ফ্রান্স বলার ভিত্তিমূলে রয়েছে এর একগুচ্ছ ফরাসী জন্মদাতাদের নাম, যেমন: ক্লদ লেভি স্ট্রস, জাক লাকাঁ, সিমোন দে বেভোয়ার, জ্যাক দেরিদা, লুই আলথুসের, মিশেল ফুকো, জুলিয়ান ক্রিস্তেভা, হেলেন সিক্সু এবং এমন আরো অনেক।

১৯৬০ এর আগের সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যের অঙ্গনে জন্ম নিলেও সে তত্ত্বের খুব মাতামাতি ছিল না। ১৯৬০ এর দশকে বিশেষ করে প্যারিসে জন্ম নেয়া সাহিত্যতত্ত্বের মাতামাতিটা খুব বেশি ছিল, কারণ তার জন্মের পিছনে একটা আন্দোলনশক্তির তীব্রতা ছিল। আন্দোলনটা ছিল প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার আন্দোলন। আন্দোলনটি দানা বাঁধার পিছনে কিছু ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন দুনিয়ার সব উল্টেপাল্টে দিয়েছিল তেমনি যুদ্ধের পরবর্তী সময়েও সামগ্রিক আর্থসামাজিক জীবনে উল্টোপাল্টা অনেক কিছু ঘটতে থাকলো। ১৯৪৫ সালের পর থেকেই কম্যুনিস্ট ও ননকম্যুনিস্ট উভয় ব্লকের দেশগুলোতে অর্থনীতির জোর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে লাগলো। এই প্রবৃদ্ধিতে কম্যুনিস্ট দেশগুলোর তুলনায় ননকম্যুনিস্ট দেশগুলো আরো বেশি ভালো করে যাচ্ছিলো। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে জনসংখ্যার হারও দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও খাদ্যশস্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে

কোথাও খুব একটা মানুষের উপবাস-অনাহার যাচ্ছিলো না। ১৯৪৫ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে মানুষের গড় আয়ু পর্যন্ত ৭ বছর বেড়ে গেল। খাদ্যশস্য উৎপাদন অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেলেও আশ্চর্যজনকভাবে এই সময়ে কৃষিক্ষেত্র থেকে মানুষ ব্যাপকভাবে পেশা বদল করে অন্য পেশায় ব্রতী হতে লাগলো।

পেশা বদলের এই ব্যাপারটির সাথে আরেকটি ভিন্ন প্রসঙ্গ জড়িয়ে গেল। মানুষ কৃষি থেকে সরে যে পেশাগুলোয় ভিড় জমাচ্ছিলো সে পেশাগুলোর কর্ম নির্বাহে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দিলো। উচ্চশিক্ষা অর্জন করে ঐ পেশাগুলোয় গিয়ে জীবনের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের প্রতি মানুষের মাঝে তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জোর থাকায় বেশিরভাগ মানুষের নিকট তাদের ছেলেমেয়েদেরকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগও সাধ্যের মধ্যে ছিল। ফলত দেখা গেল ১৯৫০ এর দশক থেকে ১৯৮০ এর দশকের মধ্যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীসংখ্যা পূর্বের তুলনায় ৩ থেকে ৯ গুণ পর্যন্ত বেড়ে গেল। ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ সালে যেখানে স্কুল কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল এক লক্ষ মাত্র, সেখানে ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাড়ে ছয় লক্ষ। এই বৃদ্ধির বড় অংশই ঘটেছিল কলা ও মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিভাগগুলোয়।

স্কুল-কলেজে ব্যাপক শিক্ষার্থী বৃদ্ধির এ ঘটনা সমাজে এক বড় প্রভাব বয়ে আনলো। এই শিক্ষার্থীদের সিংহভাগই ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের বংশের প্রথম প্রজন্ম। তাদের বাপ-দাদারা ছিলেন সমাজের বিভিন্ন পেশার খেটে খাওয়া মানুষ যাঁরা স্কুল কলেজে খুব একটা যাননি। খেটে খাওয়া মানুষের কাতার থেকে উঠে আসা এই শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষের সাথে কোনোভাবে একাত্ম হতে পারছিল না কারণ এই কর্তৃপক্ষ ছিল অনেক আগে থেকে শিক্ষিত ও সমাজের অভিজাত শ্রেণির অংশ। তাঁরা একদিকে নিজেরা ছিলেন অভিজাত, অন্যদিকে শত শত বছর ধরে তাঁরা পাঠদানও করে আসছিলেন অভিজাত শ্রেণির ছেলেমেয়েদেরকে। তাই তাঁরাও এই খেটে খাওয়া মানুষের কাতারের শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্ম হতে পারছিলেন না। এই নতুন প্রজন্ম শিক্ষার্থীদের একাত্মতা বরং ছিল সমাজের খেটে খাওয়া মানুষদের সাথে যাঁরাই সত্যিকার অর্থে তাঁদের আপনজন। এই একাত্মতার ফল হিসেবেই প্যারিসে ১৯৬৮ সালের মে মাসে ঘটে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার (anti-establishment movement) প্রথম বিস্ফোরণ। ছাত্ররা আর শ্রমিক শ্রেণির মানুষেরা একত্রে কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করে ব্যারিকেড নিয়ে নেমে পড়েন রাস্তায়। ছাত্রদের এই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সংগ্রাম অতি দ্রুত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো। আমেরিকায় এই সংগ্রাম ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করলো।

কালে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার এই আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল মানবিকী বিদ্যাসহ সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাপক অঙ্গনে। সাহিত্যের অর্থ এতদিন যাঁদের বিদ্যায় ও নির্দেশনায় তৈরি হতো বা প্রযুক্ত হতো, প্রতিষ্ঠানবিরোধী এই নতুন শিক্ষার্থীসমাজ সেই কর্তৃপক্ষকে এবং সেই কর্তৃপক্ষের অর্থপ্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠানবিরোধী চেতনায় চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। এই চ্যালেঞ্জের মুখে পূর্ববর্তী অর্থপ্রক্রিয়া ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে শুরু করলো এবং পাল্টে যেতে বাধ্য হলো। পূর্ববর্তী অর্থপ্রক্রিয়ার বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্গটি যাঁর আঘাতে প্রথম ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো তিনি হলেন জ্যাক দেরিদা (১৯৩০ - ২০০৪)। আঘাতটি এসেছিল ১৯৬৬ সালে তাঁর 'Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে। এই প্রবন্ধেই তিনি প্রথম বললেন টেক্সটের অর্থ নির্মাণে কোনো কেন্দ্রীয় একক কর্তৃপক্ষ থাকতে পারে না, কোনো কর্তৃপক্ষীয় হাত কোনো টেক্সটের অর্থ নির্মাণ বা নির্দেশনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। দেরিদার এই প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ বিরোধী ঘোষণা ১৯৬৭ সালে রোলাঁ বার্থ আরো এক ধাপ এগিয়ে নিলেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Death of the Auhor' এর মাধ্যমে। অন্য কর্তৃপক্ষ দূরে থাক, এই প্রবন্ধ টেক্সটের অর্থ নির্দেশনায় এমনকি সেই টেক্সটের লেখকের অধিকারও অস্বীকার করে দিলো। এই প্রবন্ধ বললো যে লেখক তাঁর লেখাকে নির্দিষ্ট শব্দে আটকে দিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু সেই লেখার শব্দগুলোকে নির্দিষ্ট অর্থে আটকে দেয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। ফলে লেখার অর্থের উপরে লেখকেরও আর কোনো কর্তৃপক্ষীয় হাত থাকলো না।

আমরা দেখি এই কথাগুলো যাঁরা বললেন তাঁরা সাহিত্যের লোকই নন। সাহিত্যের বাইরের লোকেরা এসে সাহিত্যের অর্থ বিষয়ে এই সব কথা বললেন মানে এই না যে, তাঁরা সাহিত্যের অর্থ নির্মাণের নতুন কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠার দাবিদার হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা বরং কথাগুলো তাঁদের দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইহিতাস এই সব ক্ষেত্রেই বলে গেলেন। কিন্তু সে কথা সারা দুনিয়ার বড় বড় মাথার মানুষকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেল যে, সব ক্ষেত্রের পুরনো কর্তৃপক্ষই নড়ে সরে গেল। সেই ঝড়ে সাহিত্যের পূর্বতন কর্তৃপক্ষও নড়ে গেল। নড়ে গেল পুরনো সাহিত্যতত্ত্ব। তখন সাহিত্যের লোকেরাই ধীরে ধীরে তাঁদের সাহিত্য জগতের পুরনো কর্তৃপক্ষ থেকে সরে গিয়ে, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি ক্ষেত্রের এই সব বড় মাথার মানুষদের বক্তব্য অনুসারে গড়ে তুলতে শুরু করলেন তাঁদের নতুন তত্ত্ব। এভাবেই ১৯৬০ এর দশকের পর থেকে সাহিত্য জগতের বাইরের মানুষদের মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণা ধার করে দুনিয়া জুড়ে উদ্ভূত হতে শুরু করলো নতুন সাহিত্যতত্ত্ব।

১৯৬০ এর দশকের পরের তত্ত্বপ্রপঞ্চ নিয়ে এত কথা বলা হলো মানে এই না যে, এর আগে সাহিত্যতত্ত্ব ছিল না। আলবত ছিল। এর আগের সাহিত্যতত্ত্ব বরং সাহিত্যের অঙ্গনে জন্ম নেয়া তত্ত্ব ছিল। তার শুরু হয়েছিল অন্যসব জ্ঞানবিজ্ঞানের মতোই প্লেটো-এরস্টিটলের হাতে। গ্রিক রোমান সেই যুগে অনেক তত্ত্বই সাহিত্যকে ঘিরে জন্ম নিয়েছিল। পরে নিওক্লাসিকাল যুগে সেসব তত্ত্ব আবার নতুন ফরমে ফিরে এসেছিল। পরে রোমান্টিকরা সেসব থেকে সরে গিয়ে নতুন তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন। রোমান্টিকদের পরে নিউক্রিটিক ও ফরমালিস্টরাও সাহিত্যকে সাহিত্যের মধ্যে রেখেই বিচারে ব্রতী ছিলেন। এসবই ছিল সাহিত্যজগতের বড় মাথাদের দান। এরপর ধীরে ধীরে সাহিত্যের তত্ত্বে একটু একটু করে প্রবেশ করতে শুরু করলো সাহিত্যের বাইরের জগতের জিনিসপত্র। প্রথমে দর্শনের হাত ধরে

মার্টিন হাইডেগার ও হুসার্ল ঢুকলেন দর্শনের তাত্ত্বিকতায় সাহিত্যকে বিচারের দিশা নিয়ে। পরে সস্যুর নামে এক ভাষাবিজ্ঞানী আসলেন ভাষার গঠন কাঠামোর তত্ত্ব নিয়ে। সেই আধা দর্শন আর আধা সাহিত্যের বিষয়ও সাহিত্যের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের তত্ত্ব অনেক নাড়িয়ে দিলো। এরপর মার্কসের সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা আসলো সাহিত্যের নতুন ব্যাখ্যায়। ফ্রয়েড আসলেন মনোবিজ্ঞানের আলোকে সাহিত্যের নতুন ব্যাখ্যায়। তারপর সব ধূলিসাৎ করে দিয়ে আসলেন ১৯৬০ এর দশকের পরের প্রতিষ্ঠানবিরোধী বিনির্মাণবাদীরা, যাঁদের কথা শুরুতেই বলেছি। সাহিত্য সমালোচনার জগতে তাঁদের তত্ত্ব এত বড় হয়ে উঠলো যে অনেকে পুরনোগুলোকে তত্ত্ব বলতেই অনাগ্রহী হয়ে উঠলেন।

তবে আমরা সাহিত্যের শিক্ষার্থীরা অধিকাংশেই মনে করি সাহিত্যতত্ত্বের যাত্রা ১৯৬০ এর দশকে নয়। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই খৃস্টপূর্ব যুগে প্লেটো-এরিস্টটলের হাত ধরে। তবে তার যাত্রার এই দীর্ঘ ইতিহাস বিষয়ে আমাদের অনেক অনুসন্ধিৎসা রয়েছে, অনেক প্রশ্ন রয়েছে। প্লেটো-এরিস্টটলের হাত ধরে শুরু হওয়া এই তত্ত্ব কালের পরিক্রমায় কখন কী রূপ পরিগ্রহ করেছিল? কেন ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাকে বিকাশের পথে আগাতে হয়েছিল? তার ক্রমবিকাশের সেই যাত্রায় কাদের কী অবদান ছিল? এই সব প্রশ্নের মোটামুটি কিছু জবাব অন্বেষণই এই লেখার উদ্দেশ্য। ফলত এর শুরুটা করতে হচ্ছে প্লেটোকে দিয়েই।

প্লেটোর সাহিত্যতত্ত্ব

ইউরোপিয় তত্ত্ব ও দর্শনে প্লেটোর (খৃ.পূ, ৪২৭ অব্দ - খৃ.পূ. ৩৪৭ অব্দ) সাথে আর কারো অবদান তুলনীয় নয়। বিংশ শতকের দার্শনিক এ এন হোয়াইটহেড গুরুত্বের সাথে বলেছেন যে, প্লেটোর পরে ইউরোপের এ যাবৎকালে অর্জিত সবটুকু তত্ত্ব ও দর্শনই মূলত প্লেটোর দর্শনের সাথে জুড়ে দেয়া কিছু ফুটনোট। ফলত, অন্যসব আলোচনার মতো সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাও তাই শুরু হওয়া উচিত এ সম্পর্কে প্লেটো কী বলেছেন তার সূত্র ধরে।

সাহিত্য বিষয়ে প্লেটোর মতামত আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে প্রথমে বলেই নিতে হয় যে, কবিদেরকে তিনি ভালো চোখে দেখেননি। তিনি যে আদর্শরাষ্ট্রের প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলেন সেখানে তিনি কবিদের কোনো জায়গা রাখেননি। প্লেটোর সময়কালে তাঁর চারপাশে জয়গান ছিল হোমার, পিন্ডার, ইস্কিলাস প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য কবিদের। অথচ তাঁদেরকেই কিনা তিনি নির্বাসিত করে দিলেন তাঁর আদর্শ নগররাষ্ট্র থেকে। কেন তাঁর এই ভাবনা? এ বিষয়ে বলার আগে আমরা সামান্য জেনে নিই প্লেটো ব্যক্তিটি সম্পর্কে।

প্লেটোর জন্ম হয়েছিল গ্রিসের এথেন্স শহরে খৃস্টপূর্ব ৫ম শতকের মাঝামাঝি। এখানেই তাঁর জ্ঞান আহরণ শুরু হয় সক্রেটিসের শিষ্যত্বে। ৩৯৯ খৃস্টপূর্বাব্দে সক্রেটিসকে হত্যার পরে প্লেটো দক্ষিণ ইটালিতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনি আবার এথেন্সে ফিরে এসে শুরু করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'একাডেমিয়া'। তাঁর জীবদ্দশায় ২য় পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধ এথেন্সে ব্যাপক ওলটপালট ঘটিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধপূর্ব এথেন্সের গৌরবকাল ও যুদ্ধপরবর্তী দুর্দশার কাল দুটোই তিনি দেখেছেন। এই যুদ্ধে তাঁর কিছু আত্মীয় স্পার্টার পক্ষে থেকে রাজাকারের ভূমিকাও পালন করেছিল। যুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি হলো তা হলো ষষ্ঠ খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীতে সোলোনের হাতে যে গণতন্ত্র এথেন্সে জন্ম লাভ করেছিল তা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভেঙ্গে গেল। এই ভাঙ্গনের মধ্য থেকে প্লেটো স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর আদর্শ নগররাষ্ট্রের। তাঁর গ্রন্থ 'দি রিপাবলিক' সেই স্বপ্নের বয়ান। স্বাভাবিকভাবেই সে বয়ান সাহিত্যকে ঘিরে নয়, বরং রাষ্ট্র ও সরকারকে ঘিরে। তবে তার মধ্যেই প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে কবি ও সাহিত্যের বিষয়। তার মধ্য দিয়েই বলা হয়ে গেছে সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ভাবনা যা আজ আমাদের কাছে সাহিত্যতত্ত্বের বীজ রূপে প্রতিষ্ঠিত।

এখানে মনে রাখতে হবে প্লেটো সাহিত্য নিয়ে যা বলেছেন তা তাঁর নগররাষ্ট্রকেন্দ্রিক ভাবনার অংশ। তাকে স্বতন্ত্রভাবে শুধু সাহিত্যের ভাবনা মনে করলে ভুল হবে। এ দিকে তাকিয়ে বলা যাবে বর্তমানে সাহিত্যকে যে ইন্টারডিসিপ্লিনারি সংশ্লেষে বিচার করা হয় তার আদিসূত্রও প্লেটোতে নিহিত ছিল। উল্লেখ্য যে, 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থটি তৎকালীন গ্রিসের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যরীতি অর্থাৎ নাট্যরীতিতে লিখিত। গ্রন্থের 'এ্যাপোলজি' অংশ বাদে পুরোটাই হলো দার্শনিক সক্রেটিসের সাথে ডায়লগ বা কথোপকথন। আমরা এই কথোকথনে যা শুনি তা শুনি সক্রেটিসের মুখ থেকে কিন্তু ধরে নিই এগুলো বলেছেন প্লেটো কারণ এই ডায়লগের লেখক প্লেটো, সক্রেটিস নন। সেভাবে সক্রেটিসের মুখ থেকেই আমরা শুনি যে সাহিত্য (তাঁর শব্দে কবিতা) হলো শব্দের মাধ্যমে অনুকরণ বা প্রতিকৃতি রচনার এক রীতি। অনুকরণ মানে আসল রূপের এক নকল তৈরি। অনকুরণকে গ্রিক ভাষায় বলা হয় মাইমেসিস। এই মাইমেসিসের বৈশিষ্ট্য সাহিত্যের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য, আবার একই সাথে সাহিত্যের সবচেয়ে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য। কারণ, নকল কোনো ভালো কাজ নয়। একারণেই যে সাহিত্যকে আদর্শিক নগররাষ্ট্র থেকে তিনি নির্বাসন দিয়েছেন সেটি হলো সেই সাহিত্য যাতে নকল করা হয় 'মানুষের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত কার্যাবলী, যে সকল কার্যের ভালো বা মন্দ একটি ফলাফল থাকে এবং সে ফলাফল অনুযায়ী মানুষের মাঝে আনন্দ বা দুঃখ সৃষ্টি হয়' ('the actions of men, voluntary or involuntary, on which, . . . a good or bad result has ensued, and they rejoice or sorrow accordingly)। এই নকলের সূত্রেই তিনি আরো বলেন যে, এই নকলকারী কবি বা সাহিত্যিক পাঠককে নীতিভ্রষ্ট করে তোলেন (implants an evil constitution), এবং তিনি একই বস্তুকে কখনো দেখান বড় করে আবার কখনো দেখান ছোট করে, ফলে সত্য থেকে তিনি খালি দূরেই সরতে থাকেন।

সাহিত্য কর্তৃক সাধিত ক্ষতি সম্পর্কে সক্রেটিসের তথা প্লেটোর এই দুই অপবাদের বিষয় একটু বিস্তৃত করা যাক। প্রথমত, সাহিত্য মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করে। কোন ধরনের সাহিত্য মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করে? এ সম্পর্কে 'দি রিপাবলিক'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে খল চরিত্র ও মানুষের গর্হিত কাজের অনুকরণ বা বর্ণনার মাধ্যমে সাহিত্য মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করে। সাহিত্যের মাধ্যমে এই কাহিনিগুলো কিশোর সমাজে পরিবেশিত হলে তাদের মানসগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা তাদের অর্জিত হবে না। এমনটাই সক্রেটিসের বা প্লেটোর মত। উদাহরণ হিসেবে তিনি হেসিওডের সাহিত্যে বর্ণিত গ্রিক দেবতা ইউরেনাস ও তার পুত্র ক্রোনাসের মধ্যকার বিবাদের গল্পের কথাও বলেছেন। সক্রেটিসের মতে এরা দেবতা হলেও তাদের এই বিবাদের গল্প তরুণ মনে নীতিভ্রষ্টতার দিকে চালিত করবে। সুতরাং সাহিত্যের মাধ্যমে এমন গল্পের বয়ান নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। এই অপবাদ দিয়ে সক্রেটিস যে সাহিত্যকে পরিত্যাজ্য বলেছেন সেটি সাহিত্যের সমগ্র রূপ নয়, সাহিত্যের একটি অংশ মাত্র। তবে সাহিত্য বিষয়ে প্লেটো বা সক্রেটিসের দ্বিতীয় অপবাদটি সাহিত্যের একটি অংশ মাত্র নিয়ে নয়, বরং সেটি সাহিত্যের সমগ্রকে নিয়ে।

সাহিত্য বিষয়ে প্লেটোর দ্বিতীয় অপবাদটি হলো সাহিত্য বস্তু বা ঘটনাকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয় অর্থাৎ মিথ্যাকে লালন করে, তাই ইহা পরিত্যাজ্য। এই অপবাদের অধীনে প্লেটো ভালো কাজের এবং মন্দ কাজের উভয়ের অনুকরণকেই পরিত্যাজ্য হিসেব প্রদর্শন করেছেন। সাহিত্য কীভাবে বস্তু বা ঘটনাকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সে সম্পর্কে প্লেটোর মতামতকে বুঝতে হলে প্লেটোর 'ফরম' সম্পর্কিত মতবাদকে প্রথমে বোঝা দরকার। বস্তুর 'ফরম' বা রূপ সম্পর্কিত মতবাদে প্লেটো বলেছেন যে দুনিয়ার সব বস্তুই মূলত ঈশ্বরের কাছে বা স্বর্গে রক্ষিত আদর্শ বস্তুটির বিভিন্ন অপূর্ণাঙ্গ অনুকরণের রূপ। যে খাটটি মিস্ত্রি বানাচ্ছেন সেটি এক এক মিস্ত্রর হাতে এক এক রকম হচ্ছে কারণ সেটি স্বর্গীয় আদর্শ খাটটির বিভিন্ন অপূর্ণাঙ্গ অনুকরণ। অপূর্ণাঙ্গ হিসেবে এভাবে দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুই মূল ও সত্যিকার বস্তুর এক একটি বিকৃত রূপ। বস্তুর আদর্শ রূপ এভাবে এক ধাপ বিকৃত হয়ে দুনিয়ায় প্রবেশ করে। এরপর কোনো শিল্পী যখন এটিকে চিত্ররূপ দেন তখন তার হাতে সেটি আরেক ধাপ বিকৃত হয়, কারণ শিল্পী তো খোদ বস্তুটি তাঁর ক্যানভাসে তুলে আনতে পারেন না, তিনি ক্যানভাসে তুলে আনেন বস্তুটির বহিরাঙ্গিক দৃশ্যমান রূপ (appearance)। আর দৃশ্যমানতা সত্য রূপ হতে পারে না। এক সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে তিনটি সমান উচ্চতার খুঁটি পুঁতে যে কোনো এক প্রান্ত থেকে দেখতে গেলে দেখা যাবে সবচেয়ে কাছের খুঁটিটি সবচেয়ে বেশি উঁচু, মধ্যেরটি তার চেয়ে খাটো এবং তৃতীয়টি আরও খাটো। শিল্পী যখন চিত্রে খঁটি তিনটি দেখাবেন তখন তিনটিকে সমান উচ্চতায় দেখোতে পারবেন না। তাকে দেখাতে হবে তিনি যেভাবে একটির পর একটি খাটো দেখছেন সেভাবে। ফলে শিল্পীর তুলিতে বস্তুর যে রূপ প্রতিভাত তা সত্যিকার বস্তুটির বিকৃতির তৃতীয় ধাপ।

শিল্পীর মতো কবিও মানুষকে শব্দের অনুকরণে মূর্ত করতে গিয়ে ঐ মানুষটিকে মূল রূপ থেকে বিকৃতির তৃতীয় ধাপে পৌঁছে দিতে বাধ্য। মানুষটির মূল রূপ হলো তার অন্তস্থ আত্মায় (inner self), যা বস্তুর স্বর্গীয় রূপের সাথে তুলনীয়। কবি মানুষটির সেই রূপকে দেখতে পান না, এবং তা অনুকরণও করতে পারেন না। তিনি অনুকরণ করেন মানুষের কাজের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত আবেগ অনুভূতির রূপটি। সেই রূপ মানুষটির অন্তস্থ রূপের (inner self), এক ধাপ বিকৃতি। আবার কবি মানুষের কাজ ও অনুভবের প্রদর্শিত রূপটিও তুলে আনেন তাঁর কাছে যেমন মনে হয় তেমন (appearance) রপে। ফলে তা আরেক ধাপ বিকৃতির শিকার হয়। এভাবে কবি যা সাহিত্যে তুলে আনেন তা 'সত্য'- এর তৃতীয় বিকৃত ধাপ।

অনুকরণরূপী সাহিত্যের (mimetic literature) বিষয়ে আরো একটি অপবাদ প্লেটো বা সক্রেটিসের পক্ষ থেকে রয়েছে। সে অপবাদ মতে সাহিত্যের মাধ্যমে জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানতার প্রচার ঘটে। প্লেটো বলতে চান যে, কবি বা সাহিত্যিক মানুষের ভালো দিক বা সদাত্মার যে প্রচার করবেন তা তো কবির পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর মতে মানুষের সদগুণ বা সদরূপ হলো তাঁর প্রশান্ত অন্তরাত্মা (harmoniously organised innerself)। এই সদরূপ পরিচালিত হবে শুধু যুক্তি (reason) দ্বারা। তার মধ্যে কোনো আবেগ বা অনুভবের বহিপ্রকাশ থাকবে না। এই 'প্রশান্তিময়তা' সদাত্মার আবশ্যিক গুণ। কিন্তু এমন প্রশান্তিময় সদাত্মার তো কোনো বাহ্যিক প্রকাশ সম্ভব নয়, ফলে কবির পক্ষে তা অনুকরণ করাও সম্ভব নয়। ফলে কবি যাকে সদাত্মার অনুকরণ রূপে প্রকাশ করছেন তা মূলত কবির একটি অজ্ঞানতার প্রচার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা যে হোমারকে জানি যে, তিনি সদাত্মার অনুকরণ করে মানুষকে সৎ ও শুভ পথে চরিচালনায় সাহায্য করছেন, তা এই অজ্ঞানতার প্রচারের কারণে আমাদের মধ্যে চলমান একটি ভুল জ্ঞান। হোমার বা ইস্কিলাস কারো পক্ষেই সদাত্মার অনুকরণই সম্ভব নয়, যেহেতু সদাত্মার কোনো প্রকাশিত ও প্রদর্শিত রূপই নেই। একই সাথে মাইমেটিক আর্ট হিসেবে সাহিত্যের প্রতি প্লেটোর আরেকটি অপবাদ হলো সাহিত্য সদাত্মার প্রকাশ বা প্রচার ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে মানুষের ভিতরে দুষিত ও নষ্ট অনুভবের জঞ্জাল উৎপাদন করে।

সক্রেটিস ও প্লেটো সাহিত্যকে এভাবেই তুলোধুনো করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে। কবিদেরকে প্লেটো তাঁর আদর্শ নগররাষ্ট্রে কোনো স্থান দেননি। কিন্তু মজার বিষয় হলো সাহিত্যকে তুলোধুনো করে এত কথা যিনি 'দি রিপাবলিক'- এ লিখলেন তাঁর নাট্যরীতিতে লিখিত সেই 'দি রিপাবলিক'ও কি একটি সাহিত্যগ্রন্থ নয়? সে প্রশ্ন করার জন্য সক্রেটিস বা প্লেটো কেউই আমাদের সামনে উপস্থিত নেই। তবে আমাদের সামনে উপস্থিত আছে প্লেটোর যোগ্য শিষ্য এরিস্টটলের 'পোয়েটিকস'। আমরা দেখতে চেষ্টা করবো অনুকরণরূপী শিল্প হিসেবে সাহিত্যের যত দোষ এরিস্টটলের গুরুরা বললেন, এরিস্টটল সেই দোষ কতটা স্বীকার করলেন।

এরিস্টটলের সাহিত্যতত্ত্ব

এরিস্টটল (৩৮৪ খৃ.পূ. - ৩২২ খৃ. পূ.) ছিলেন প্লেটোর সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র। তাঁর জন্ম মেসিদোনিয়ায়। ১৭ বছর বয়সে তিনি এথেন্সে এসে প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ৩৪৭ খৃস্টপূর্বাব্দে প্লেটোর মৃত্যুর পরে তিনি এথেন্স ত্যাগ করেন। ৩৩৫ খৃস্টপূর্বাব্দে তিনি পুনরায় এথেন্সে ফিরে আসেন এবং তাঁর স্কুল লাইসিয়াম শুরু করেন। ৩২২ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি লাইসিয়াম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং ঐবছরই ক্যালচিস নামক শহরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। বলতে গেলে জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা যার ওপর এই ৬২ বছরের জীবনে এরিস্টটল কাজ করেননি। জ্ঞানবিজ্ঞানের এই সকল শাখায় তিনি যে বইগুলো রচনা করেছিলেন সেগুলো হারিয়ে গেছে। যা আছে তা সম্ভবত তার লেখা বই নয়, বরং খুব সম্ভবত তাঁর কাছ থেকে নেয়া বিভিন্ন লেকচার নোটের সংকলন। ফলে এগুলো প্লেটোর 'দি রিপাবলিক'-এর মতো সুলিখিত নয় এবং সাহিত্যগন্ধীও নয়। সাহিত্য বিষয়ে 'পোয়েটিকস' নামে তাঁর যে বইটি আমাদের কাছে আছে সেটিও সেরকম একটি লেকচার নোটের সংকলন। নোটগুলো তিনি হয়তো তাঁর লাইসিয়ামে লেকচারের জন্য তৈরি করেছিলেন। ফলে গ্রন্থভুক্ত বিষয়গুলোর আলোচনায় সুসংগঠিত পরম্পরা নেই, এবং ক্ষেত্র বিশেষে অনেক অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা রয়েছে। তারপরও এটিই সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে দুনিয়ার সকল দেশে সবচেয়ে বেশি রেফারেন্স দেয়ার একটি বই। এরিস্টটলের সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা মানে হলো এই বইটি নিয়েই আলোচনা।

'পোয়েটিকস' গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলোকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। পরিচ্ছেদ-১ থেকে পরিচ্ছেদ-৫ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রথম পর্বটিকে বলা যেতে পারে গ্রন্থটির সূচনা পর্ব যেখানে মাইমেসিস বা শিল্পের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য অনুকরণের অর্থ ও প্রকরণের আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের বিস্তৃতি পরিচ্ছেদ-৬ থেকে পরিচ্ছেদ-২২ পর্যন্ত। এ পর্বে মাইমেটিক আর্ট বা অনুকরণ শিল্পের একটি রূপ হিসেবে ট্রাজেডির গঠন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে। পরিচ্ছেদ ২৩ থেকে ২৬ পর্যন্ত তৃতীয় পর্বে রয়েছে ট্রাজেডির সাথে মহাকাব্যের তুলনা। আমরা এখানে বইটির পরিচ্ছেদ ধরে আলোচনা করবো না। আমরা এখানে বরং 'মাইমেসিস' বিষয়ে এরিস্টটল ও প্লেটোর ভাবনার পার্থক্য এবং সেই পার্থক্যের সূত্র ধরে এরিস্টটল কর্তৃক সূচিত সাহিত্য বিষয়ক নতুন ভাবনার গতিপথ দেখবো।

একথা বহু পণ্ডিতে বলেছেন যে, এরিস্টটলের পোয়েটিকস ভিতরে ভিতরে প্লেটোর মাইমেসিস থিয়োরির একটি সমালোচনা এবং মাইমেসিসের বিরুদ্ধে প্লেটোর উচ্চারিত অপবাদগুলোর একটি জবাব। তবে সে জবাব সরাসরি নয়, হয়তো তাতে গুরুনিন্দা হয় বলেই এরিস্টটল সরাসরি প্লেটোর নামও উচ্চারণ করেননি এবং প্লেটোর অপবাদের ধরে ধরে একটি একটি করে জবাবও দেননি।

প্লেটোর আলোচনার মতোই এরিস্টটলও তাঁর আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছেন মাইমেসিসকে, তবে মাইমেসিসের কোনো সংজ্ঞা দেয়ার তিনি প্রয়োজন করেননি। সংজ্ঞা দিলে সে সংজ্ঞা গুরুর ভাবনার প্রতি সরাসরি দ্রোহ রূপে উচ্চারিত হবে সে ভাবনায়ও তিনি মাইমেসিসের সংজ্ঞা না দিয়ে থাকতে পারেন। তবে সংজ্ঞায় না বললেও আলোচনায় এরিস্টটল ধীরে ধীরে স্পষ্ট করেছেন তিনি কীভাবে মাইমেসিস বিষয়ে প্লেটো থেকে আলাদাভাবে ভাবছেন। প্লেটো বার বার বলেছেন যে, মাইমেসিস হলো প্রকৃতিকে এবং প্রকৃত বস্তুকে সত্য ও সঠিক রূপ থেকে ধাপে ধাপে বিকৃত করার একটি প্রয়াস। অথচ এরিস্টটল তাঁর পোয়েটিকসের ৪ নং পরিচ্ছেদে লিখেছেন 'Poetry in general seems to have sprung from two causes, each of them lying deep in our nature. First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation he learns his earliest lessons; and no less universal is the pleasure felt in things imitated.'

আশ্চর্যের সাথে লক্ষণীয় যে এই বাক্যদুটোতে এরিস্টটল যতগুলো অবধারণকে প্রকাশ করেছেন তার সবগুলোই প্রায় সরাসরি মাইমেসিস বিষয়ে প্লেটোর অবধারণগুলোকে অস্বীকার করে। প্লেটো বলেছেন মাইমেসিস প্রকৃতিকে তথা প্রকৃত সত্যকে একধাপ বিকৃত করে। তার মানে প্লেটোর মতানুযায়ী মাইমেসিস একটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ প্রক্রিয়া। কিন্তু এরিস্টটলের মতে মাইমেসিস প্রকৃতির গভীরে প্রোথিত এবং প্রকৃতির গভীর থেকে উৎসারিত (lying deep in our nature)। এরিস্টটলের মতে অনুকরণের প্রবৃত্তি মানবের জন্ম থেকে অর্জিত। তাই এ প্রবৃত্তি পরিহার্য তো নয়ই বরং এই প্রবৃত্তিই মানুষকে পশুজগতের থেকে আলাদা করেছে, অর্থাৎ এটি মানবজন্মকে মহীয়ান করে তুলতে পারে এমন এক চর্চা। অথচ প্লেটো বলেছিলেন মাইমেসিস বা অনুকরণ মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারের দিকে চালিত করে। আরো এক ধাপ এগিয়ে এরিস্টটল বলেছেন অনুকরণ একটি সার্বজনীন নান্দনিক আনন্দের উৎস। প্লেটো বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই অনুভব করতেন যে, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য এই অবধারণগুলোর প্রতিটির মধ্য দিয়ে তাঁকে একটি করে চপেটাঘাত করছেন।

মাইমেসিসকে এভাবে মহীয়ান করে তুলে এরিস্টটল ইহাকে শিল্পের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন শিল্পের যতরূপ আছে সবই আদিতে অনুকরণ। শিল্পের রূপ নির্ধারিত হয় অনুকরণের মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে। অনুকরণের মাধ্যম ভাষা হলে শিল্পরূপটির নাম হয় সাহিত্য, মাধ্যম সুর হলে তার নাম হয় সঙ্গীত, মাধ্যম ছন্দ (rhythm) হলে তার নাম হয় নৃত্য। অনুকরণের মাধ্যমের পরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অনুকরণের বস্তু বা বিষয়টি। অনুকরণের বিয়য়বস্তু মহৎ মানুষের কর্মকাণ্ড হলে নির্মিত হয় মহাকাব্য বা ট্রাজেডি আর নিচশ্রেণি বা খল চরিত্রের মানুষের অনুকরণের মধ্য দিয়ে নির্মিত কমেডি। অনুকরণের অন্তর্গত এই সকল বিষয় বিবেচনায় রেখেই মাইমেসিস সম্পর্কে ভাবতে হবে। মাইমেসিসকে ভাবতে হবে অনুকরণের মাধ্যম, বিষয় ও চারিত্র্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করে, প্লেটোর 'ফরম' সম্পর্কিত মতবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে নয় কিংবা মিরর ইমেজের উৎপাদক হিসেবে জ্ঞান করে নয়। 'ফরম' সম্পর্কিত প্লেটোর মতবাদের সাথে মিলাতে গেলেই মাইমেসিসের দায় হয়ে পড়ে যে বস্তুকে সে অনুকরণ করছে তার একটি দার্পণিক প্রতিবিম্ব বা মিরর ইমেজ তৈরি করা। কিন্তু মাইমেসিস তার মাধ্যম, বিষয়বস্তু আর চরিত্রগত আচার (manner) দ্বারা এমনভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটি বিষয় যে তার দায় পড়েনি বস্তুর দার্পণিক প্রতিবিম্ব তৈরি করা। এভাবে ভাবতে পারলে মাইমেসিসকে মুক্ত করা যাবে

প্লেটোর আরোপিত অপবাদগুলো থেকে। এ কথা বোঝাতেই এরিস্টটল 'পোয়েটিকস'-এর একদম শুরুতেই বলেছেন I propose to treat of poetry in itself। এই in itself এর ইঙ্গিত হলো মাইমেসিসকে প্লেটোর 'ফরম' সম্পর্কিত মতবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে ভাবা যাবে না। এভাবে এরিস্টটল প্লেটোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে মাইমেসিসকে শুধু শিল্প অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিতই করেননি, মাইমেসিসের মাধ্যমে অর্জিত শিল্পের রূপ ও প্রকরণ সম্বন্ধেও তিনিই প্রথম তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছেন।

এরিস্টটলের তত্ত্বমতে সাহিত্য মাইমেটিক আর্ট হিসেবে দার্পণিক প্রতিবিম্ব তৈরি করে না, বরং বস্তুর আইকন তৈরি করে। এরিস্টটল 'পোয়েটিকস'-এর ৪র্থ পরিচ্ছেদে লিখেছেন 'Thus the reason why men enjoy seeing a likeness is that in cotemplating it they find themselves learning or inferring, saying perhaps 'Ah, that is he'. For if you happen not to have seen the original, the pleasure will be due not to the imitation as such, but to the execution, the colouring, or some such other cause.' এরিস্টটল এখানে বলেছেন যে, মাইমেসিসের কাজ হলো সাদৃশ্যভিত্তিক, সাদৃশ্যের মাধ্যমে অনুকৃত বস্তুর কাছাকাছি যাওয়া (seeing a likeness), মোটেই অবিকল বস্তুটি উৎপাদন করা নয়। আর এই সাদৃশ্যের জন্য মূল বস্তুটি আদৌ দরকারিও নাও হতে পারে। কারণ মূল বস্তু আদৌ না দেখেও, শুধু অনুকৃত বস্তু দেখেও আনন্দ লাভ ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে অনুকরণ নয়, কাজটির সম্পাদন (execution), সে সম্পাদনে রঙের ব্যবহার বা অন্য কোনো বিষয়ের কারণেও আনন্দটি লাভ করা যেতে পারে। মোটের ওপরে এরিস্টটল পুরোপুরি সরে গেছেন প্লেটোর সেই আপ্ত ধারণা থেকে যে, মাইমেটিক আর্টের কাজ হলো বস্তুর প্রতিবিম্ব উৎপাদন। এরিস্টটল বরং বলতে চান অনুকৃত বস্তু কোনোদিন না দেখেও বস্তুর এই অনুকরণশিল্পের সাধনা সম্ভব। কথাটি আরো স্পষ্ট হয় 'পোয়েটিকস'-এর ২৫তম পরিচ্ছেদে। সেখানে এরিস্টটল বলছেন not to know that a hind has no horns is a less serious matter than to paint it inartistically। দেখা যাচ্ছে, শিং সমেত একটি হরিণী অংকন করা যা বস্তু সত্যের পুরো লঙ্ঘন তা-ও মাইমেটিক আর্টে মেনে নেয়া সম্ভব। তার মানে হলো মাইমেটিক আর্টের কাজ নয় প্রকৃতির প্রতিবিম্ব নির্মাণ, তার কাজ হলো অনুকরণের নিজস্ব রীতি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকে নান্দনিক আনন্দ সৃষ্টির লক্ষ্যে বস্তুর প্রতীকী উপস্থাপন বা বস্তুর আইকন নির্মান।

আইকন মানে ঠিক বস্তুটি নয়, বরং বস্তুর সাথে অপিরহার্য সম্পর্কযুক্ত এমন কিছু যা ঐ বস্তুকে বোঝায়। 'গাছ' দ্বারা আমরা যে বস্তুটি বুঝি তার সাথে 'গাছ' ধ্বনির কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক নেই, বরং যে সম্পর্কটি আছে তা সম্পূর্ণ খামখেয়ালি গোছের। ফলে 'গাছ' শব্দটি বস্তু গাছের কোনো আইকন নয়। কিন্তু একটি মুখমণ্ডলের ছবি মুখমণ্ডলটির আইকন কারণ এর সাথে মুখমণ্ডলটির অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য সম্পর্ক রয়েছে। একটি মুখমণ্ডলের ছবি, সত্যিকারের কোনো মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতি না হয়েও আইকনিক হওয়ার মধ্য দিয়ে আনন্দ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, যেমন কার্টুনের জন্য আঁকা মুখমণ্ডলগুলো আমাদেরকে আনন্দ দিয়ে থাকে। কার্টুনরূপ মনুষ্য চেহারা মানুষের চেহারার সাথে ন্যূনতম সাদৃশ্য নিয়েই মাইমেটিক আর্ট হতে পারছে, কোনো নির্দিষ্ট চেহারার সাথে আদৌ সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হচ্ছে না। ঐ ন্যূনতম সাদৃশ্য থেকেই দর্শক চিনতে পারছে আইকনটি কিসের? আর চিনতে পারার মধ্য দিয়েই তার মধ্যে এক আনন্দ অনুভবের অনুরণন ঘটছে। আইকনিক উপস্থাপনার দ্বারা এরিস্টটল এরূপ মাইমেটিক আর্টের কথা বলেছেন যা প্লেটোর বলা মাইমেটিক আর্টের ভাবনা থেকে যোজন যোজন দূরের ভাবনা। প্লেটো মাইমেটিক আর্টকে বর্জনীয় বলছেন কারণ, এই আর্ট বস্তুর প্রতিবিম্বে খুঁত তৈরি করে (flawed image), আর এরিস্টটল মাইমেটিক আর্টের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে সেই খুঁতকেই মূল্যায়ন করছেন। এই ভাবনা দ্বারা এরিস্টটল নিশ্চিত করছেন যে, মাইমেটিক আর্টের উৎকর্ষের পরিমাপক মোটেই সাদৃশ্যের সঠিকতা নয় বা নিখুঁত সাদৃশ্য নয়। বরং এর উৎকর্ষের পরিমাপক হবে আর্ট হিসেবে চর্চার জন্য এর উপযোগী বিভিন্ন কলাকৌশল ও রীতিনিয়ম। যা ঘটে তার নিখুঁত বর্ণনা মাইমেটিক আর্ট হলে ইতিহাস হতো ট্রাজেডি বা কমেডির চেয়ে উঁচু সাহিত্য। অথচ আমরা জানি ইহিতাস সাহিত্য নয়, বরং ট্রাজেডিই সাহিত্য। ট্রাজেডি যা ঘটেছে তার বয়ান নয়, যা ঘটতে পারে তার বয়ান। যা ঘটেছে তা নয়, বরং যা ঘটতে পারে বা পারতো মাইমেসিসের মাধ্যমে তার অনুকরণের দিকেই এরিস্টটলের আহ্বান।

প্লেটো সাহিত্য বা মাইমেটিক আর্টকে নিষিদ্ধ করার পিছনে একটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন এই যে, ইহা মানুষের অনুভবগুলোকে জাগিয়ে তুলে তার যুক্তিবুদ্ধিকে (Reason) বিনষ্ট করে। প্লেটোর এই বক্তব্যের বিপরীতে রয়েছে এরিস্টটলের 'ক্যাথারসিস' তত্ত্ব। এরিস্টটলের ক্যাথারসিস তত্ত্ব অনুযায়ী ট্রাজেডি মানুষের মাঝে 'করুণা' ও 'ভীতি'র অনুভব (pity and fear) জাগিয়ে মানুষের যুক্তিবুদ্ধিকে (Reason) বিনষ্ট তো করেই না, বরং এই অনুভূতিগুলো প্রবলভাবে জাগিয়ে তুলে তা মানুষের অনুভবরাজ্য থেকে সরিয়ে দিয়ে অর্থাৎ মানুষের অনুভরাজ্যের অপদ্রব্য সরিয়ে দিয়ে মানুষটিকে বিশুদ্ধ করে তোলে এবং এর মাধ্যমে মানুষটির যুক্তিবুদ্ধি (Reason) আরো পরিষ্কার হয়, শাণিত হয়। এভাবেই এরস্টিটল তাঁর পোয়েটিকসে পরোক্ষে সাহিত্যের বিরুদ্ধে তাঁর গুরুর উত্থাপিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করেছেন এবং অনুকরণধর্মী শিল্প হিসেবে সাহিত্যের জয়গান উচ্চারণ করেছেন যা সাহিত্যের পাঠকদেরকে সাহিত্য বুঝতে ও সাহিত্যের রসাস্বাদনে হাজার হাজার বছর চিন্তার আশ্রয় হিসেবে কাজ করেছে। সাহিত্য সম্পর্কে এরিরস্টলের এই ভাবনার পরে আমরা আসবো রোমান যুগের আর এক সাহিত্যবোদ্ধার ভাবনার সাথে পরিচিত হতে। তিনি হলেন লঞ্জাইনাস, যাঁর নাম আমরা অনেকে লঙিনুস রূপে উচ্চারণ করে থাকি।

লঞ্জাইনাসের সাবলাইম তত্ত্ব

গ্রিক পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমরা সাহিত্য বিষয়ে পেয়েছি 'মাইমেসিস' তত্ত্ব আর রোমান যুগ থেকে পেয়েছি 'সাবলাইম' তত্ত্ব। সাবলাইম তত্ত্বও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। মাইমেসিস তত্ত্বের বিষয়বস্তু হলো সাহিত্যের কার্যধারা আর সাবলাইম তত্ত্বের বিষয়বস্তু হলো সাহিত্যের শৈলী। সাবলাইম তত্ত্বটি যে গ্রন্থ থেকে আমরা গ্রহণ করেছি সে গ্রন্থটিও গ্রিক ভাষায় লিখিত এবং লেখার সময়কাল খৃস্টীয় প্রথম শতক। বইটির গ্রিক নাম 'পেরি হিপসুস' (Peri Hypsous) ইংরেজিতে 'On Sublime'। বইটির নাম আমরা জানলেও এটির লেখক কে তা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। ১৫৫৪ সালে এটি প্রথম মুদ্রিত হয় এবং সে মুদ্রণে লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল ডায়োনিসিয়াস লঞ্জাইনাস (Dionysius Longinus)। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম লেখা ছিল Dionysius Or Longinus; Dionysius Longinus নয়। এই আবিষ্কারের পর থেকে অনেক ইতিহাস খোঁড়াখুঁড়ি হয় আসল লেখকের নাম উদ্ধারের জন্য। অনেক নাম আসে। অনেক বিতণ্ডা হয়। শেষে রেগে গিয়ে স্থির করা হয় এর লেখক হলেন Pseudo-Longinus, অর্থাৎ জনৈক 'ভুয়া' লঞ্জাইনাস।

সাবলাইম সম্পর্কে প্রথম কথায়ই লঞ্জাইনাস বলছেন যে এটি হলো ভাষার উচ্চতা আর চমৎকারিত্ব (loftiness and excellence of language)। মহান লেখকরা তাঁদের লেখার এই গুণের ভিত্তিতে অত্যুচ্চ খ্যাতি আর অমরত্ব অর্জন করে থাকেন। ভাষার এই উচ্চতা আর চমৎকারিত্ব অর্জিত হলো কিনা তা নির্ভর করে ভাষাটি পাঠকের উপর কী প্রভাব ফেললো তার উপর। দেখতে হবে ভাষাটি পাঠককে তার ভিতর থেকে বের আনলো কিনা। ভাষাটি যদি যুক্তিপ্রধান হয় তাহলে তার কাজ হবে পাঠককে কোনো সিদ্ধান্তের দিকে প্ররোচিত করা। এক্ষেত্রে পাঠকের নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধি সেই প্ররোচনার বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতে শক্তি জোগাবে। পাঠক নিজের যুক্তিবুদ্ধির জোর দ্বারা সেই ভাষার শক্তিকে দমিত করতে সমর্থও হতে পারে। এই প্রকার ভাষা সাবলাইম নয়; এই ভাষা পাঠককে তার অবস্থান থেকে, তার কোটর থেকে নাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয় না। ফলে যুক্তিতর্কের প্ররোচনাময় ভাষা সাহিত্যের 'সাবলাইম' ভাষার মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। সাহিত্যের ভাষা হবে সেই ভাষা যার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো পাঠকের কোনো শক্তি থাকবে না। আরব্য একটি ধ্রুপদী কথা আছে কবিতার ব্যাপারে যা লঞ্জাইনাসের এই সাবলাইম ধারণাকে প্রতিধ্বনিত করে। আরব্য সেই ধ্রুপদী সংজ্ঞায় বলা হয়েছে কবিতা হলো সেই ভাষা যা শ্রোতার কানের অনুমতি ছাড়া হৃদয়ে প্রবেশ করে। লঞ্জাইনাসও সাহিত্যের সেই ভাষাকে সাবলাইম বলেছেন যা অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পাঠককে নাড়িয়ে দেয়, পাঠককে তার ভিতর থেকে এমন শক্তিতে বের করে আনে যে পাঠক ইচ্ছে করলেও সে শক্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়তে পারে না। এই ভাষা যখন পাঠককে আন্দোলিত করে পাঠক তখন বিমূঢ় হয়ে যায়। লঞ্জাইনাসের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, সাহিত্যগত ভাবনাবিষয়ে লঞ্জাইনাস অনেকটাই প্লেটোপন্থী, এরিস্টটলপন্থী নন। প্লেটো বলেছেন সাহিত্য যুক্তিবুদ্ধিকে নষ্ট করে এবং আবেগের উপদ্রবকে বাড়িয়ে তোলে। লঞ্জাইনাস সেই সুরেই বলেছেন যে, মহৎ সাহিত্যের ভাষা মানুষের যুক্তিবুদ্ধিকে বজ্রাঘাতে আহতের মতো থ' বানিয়ে দেয় এবং পাঠককে তার আবেগের ও অনুভবের স্রোতে ভাসিয়ে নেয়।

অবশ্য প্লেটোর অনুসরণে লঞ্জাইনাস সাহিত্যের ভাষার এই শক্তিকে অভিযুক্ত করেননি এবং সাহিত্যকে নিষিদ্ধ করার কথাও বলেননি। উপরন্তু, বইয়ের ৭ম অধ্যায়ে এসে, মনে হচ্ছে, তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি যা বলছেন তার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের ভাষার একটি ক্ষতিকর দিকের কথা তিনি বলে ফেলেছেন। তাই এবারে সেই ক্ষতি পোষাতে গিয়ে তিনি একটু স্ববিরোধী হয়েই বললেন- 'সাহিত্যের সাবলাইম ভাষা পাঠকের আত্মার জন্য উচ্চভাবনার খোরাক জোগায়' (dispose[s] the soul to high thoughts . . . leave[s] in the mind more food for reflection than the words seem to convey)। লঞ্জাইনাসের টেক্সটের বিশ্লেষণে স্টিফেন হ্যালিওয়েল এর নাম দিয়েছেন 'অর্থের অতিরিক্ত' বা 'অর্থের উদ্বৃত্ত' (surplus of meaning)। তিনি মনে করেন সাহিত্যের সাবলাইম ভাষা এভাবে অর্থের অতিরিক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠককে এক গভীরতর বাস্তবতার দিকে নিয়ে যায়। যুক্তিবুদ্ধির সাধারণ চর্চার মাধ্যমে উপলব্ধির সে গভীরতায় কখনো পৌঁছা সম্ভব নয়।

সাহিত্যের এই মহীয়ান অর্থাৎ সাবলাইম ভাষা কীভাবে তৈরি হবে, এর উপাদান কী কী- এ বিষয়েও লঞ্জাইনাস তাঁর বইয়ে আলোচনা করেছেন। লঞ্জাইনাসের মতে সাহিত্যের সাবলাইম ভাষার উপাদান বা উপকরণ হলো পাঁচটি: ১. মহৎ ভাব ধারণের ক্ষমতা, ২. প্রচণ্ড আবেগ জাগানোর ক্ষমতা, ৩. ভাষার অলংকার (figures of speech), ৪. উচ্চমার্গীয় শব্দ, ও ৫. শব্দের মহৎ বিন্যাস। প্রথম দুটি উপাদান বিষয়ে লেখকের কিছু করণীয় নেই। মহৎ ভাব ও উচ্চ আবেগের বিষয় হলো লেখার বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট। লেখার বিষয়বস্তুর এই মহিমা না থাকলে শুধু লেখকের কারিগরি যোগ্যতার জোরে সাহিত্যকে সাবলাইম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই বলেই লঞ্জাইনাসের ধারণা। সাবলিমিটি অর্জনের বাকি তিনটি উপাদান সম্পূর্ণই লেখকের কারিগরি যোগ্যতার অংশ। লেখককে জানতে হবে কীভাবে ভাষায় চমৎকার ও মনোহর অলংকার সৃষ্টি করতে হয়, কীভাবে উচ্চমার্গীয় শব্দ খুঁজে পেতে হয় এবং কীভাবে সে শব্দমালা মহৎ শৈল্পিক বিন্যাসে বাঁধতে হয়।

লঞ্জাইনাসের মতে মহৎ ভাব ও উচ্চ ভাব তিনভাবে অর্জিত হতে পারে। প্রথমত, এটি ঈশ্বরের দান হিসেবে লেখকের মনে আপনা-আপনি জন্ম নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, মহৎ লেখকরে লেখা অনুকরণ করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হতে পারে। তৃতীয়ত, কল্পনার জোরেও এটি অর্জিত হতে পারে বলে লঞ্জাইনাসের বিশ্বাস। লক্ষণীয় যে, সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে লঞ্জাইনাসই প্রথম কল্পনার ব্যাপারটি সাহিত্যে গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। লঞ্জাইনাসের এই কথা একটু ভিন্নভাবে রোমান্টিক যুগে প্রবলভবে আবার ফিরে এসেছে। তবে তার পূর্বে ইংরেজি তথা ইউরোপিয় সাহিত্যে পুরো গ্রিক ও রোমান ভাবনাকে পাথেয় ধরে রেনেসাঁস যুগে নির্মিত হয়েছিল সাহিত্যের তাবৎ নমুনা ও আদর্শ। গ্রিক ও রোমান ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে; প্লেটো, এরিস্টটল ও লঞ্জাইনাসের চিন্তার অনুসারী হয়ে সাহিত্যের সেই নমুনা ও

আদর্শকে ঘিরে যে তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছিল তার সুপরিচিত নাম হলো নিওক্লাসিসিজম বা নব্যধ্রুপদীবাদ। আমাাদের পরের আলোচনা এই নিওক্লাসিসিজম নিয়ে।

নিওক্লাসিসিজম

সাহিত্যতত্ত্বে নিওক্লাসিসিজম বিষয়টি এক এক দেশের জন্য এক এক রকমের। দেশভেদে ও সাহিত্যভেদে এর সময়কাল এবং বিষয়বস্তুতে স্পষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। আমরা এখানে যে শুধু ব্রিটেনভিত্তিক ইংরেজি সাহিত্যের নিরিখে নিওক্লাসিসিজম বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। নিওক্লাসিসিজম শব্দটি ইংরেজিতে ব্যবহৃত হলেও এর খাঁটি ইংরেজি হলো নিউক্লাসিসিজম। বাংলা করলে দাঁড়ায় নব্য ক্লাসিসিজম। ক্লাসিসিজম মানে হলে ক্লাসিকসের ভিত্তিতে দাঁড় করানো সাহিত্য ভাবনা। ইংরেজ তথা ইউরোপিয় ভাবনায় ক্লাসিক হলো গ্রিক ও রোমান সাহিত্য। সোজা করলে নিওক্লাসিসিজমের অর্থ দাঁড়ায় গ্রিক ও রোমান সাহিত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাহিত্যভাবনা বা সাহিত্যতত্ত্ব।

শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে আহরিত এই অর্থের সাথে নিওক্লাসিসিজমের ব্যবহারিক অর্থ খুব একটা আলাদা নয়। সারা ইউরোপ জুড়ে রেনেসাঁস পরবর্তী শিক্ষিত মহল তাদের সাহিত্যের দিকনির্দেশনা সংগ্রহ করতে শুরু করলো গ্রিক ও রোমান ক্লাসিকস থেকে তারই ফসল হিসেবে তৈরি হলো নিওক্লাসিক সাহিত্য মতবাদ। ইংরেজ দেশে এই সময়টা হলো মোটামুটি ১৬৬০ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত, অর্থাৎ ইংরেজ পিউরিটান আন্দোলনের নেতা অলিভার ক্রমওয়েলকে হত্যার পর থেকে ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের হত্যার আগ পর্যন্ত সময়কাল। রেনেসাঁসের পর থেকে রোমন্টিকের শুরু পর্যন্ত সময়কাল।

নিওক্লাসিসিজমের সময়কালটাকে সাহিত্য বিষয়ক ফতোয়ার কালও বলা যেতে পারে। এসময় কোনটা সাহিত্য হলো আর কোনটা সাহিত্য হলো না তা গ্রিক ও রোমান ক্লাসিকসে যাঁরা পণ্ডিত ও জ্ঞানী ছিলেন তাঁদের ফতোয়ার উপর নির্ভর করতো। কবিতাটির ফর্ম কী হবে, তার ছন্দ কী হবে, তার অলঙ্কার কী হবে সব ক্ষেত্রেই তখন ক্লাসিকস থেকে নির্দেশনা আহরণ করতে হতো। আর সে নির্দেশনা শুধু কবিতার জন্য নয়, সাহিত্যের সব শাখার জন্যই এসময় ক্লাসিক সাহিত্য থেকে ফতোয়া আর কানুন আহরণ করতে হতো। সেসব ফতোয়া দিয়ে আলক্সান্ডার পোপ দুখানা গ্রন্থও লিখে ফেলেছিলেন: একখানা 'An Essay on Criticism', অপরখানা 'Essay on Man'। দুখানাই কবিতায় লেখা প্রবন্ধ। শেষোক্ত প্রবন্ধখানায় গ্রিক-রোমানদের সাহিত্যের এইসব ফতোয়া বা কানুনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে পোপ সোজা বলে দিয়েছিলেন যে, এসব নিয়মকানুন কোনো মানুষের তৈরি জিনিস নয়, এগুলো খোদ ভগবানের তৈরি। ভগবান যেমন প্রকৃতি বানিয়ে আমাদেরকে দিয়েছেন, তেমনি এগুলোও আমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছেন। মানুষ খালি এগুলোকে প্রকৃতি থেকে খুঁজে নিয়ে একটু সাজিয়েছে মাত্র। পোপের ভাষায়- Those rules of old discover'd, not devis'd/ Are Nature still, but Nature methodis'd।

ক্লাসিক সাহিত্যের নিয়মকানুন দিয়ে সাহিত্যকে শাসনের যুগ হিসেবে নিওক্লাসিকাল যুগ মৌলিকভাবে পরিচিত হলেও সাহিত্য বিষয়ক ভাবনা ও চর্চায় এর আরো কিছু ভিন্নতর অনুষঙ্গও রয়েছে। রেনেসাঁস যুগে ঈশ্বরকে সরিয়ে দিয়ে মানবের জয়গানের যে সূচনা হয়েছিল নিওক্লাসিকাল যুগে এসে সে জয়গানের একটু লাগাম টেনে ধরা হলো। নিওক্লাসিকাল যুগের সাহিত্য তার বিষয়বস্তুতে মানবের জয়গান না গেয়ে বরং মানবের ত্রুটি ও স্খলনের জায়গাগুলো ব্যাপকভাবে তুলে আনতে শুরু করলো। ক্লাসিক গ্রিক সাহিত্যে ভালো মানুষ নিয়ে ছিল মহাকাব্য আর ট্রাজেডি, এবং খারাপ মানুষ নিয়ে ছিল স্যাটায়ার আর কমেডি। নিওক্লাসিকাল যুগ ক্লাসিকাল যুগের সেই ভালো মানুষের সাহিত্য রচনায় নামলো না, বরং উঠে পড়ে নামলো খারাপ মানুষের সাহিত্য রচনায়। ফলে এই যুগে ক্লাসিকাল ধারায় মহাকাব্য আর ট্রাজেডি তেমন আসলো না, আসলো হরেক জাতের কমেডি, আর আসলো হরেক জাতের স্যাটায়ার। এমনকি মহাকাব্যের রূপকেও তারা মক-এপিক নামের নতুন ধারায় স্যাটায়ার রচনার কাজে ব্যবহার শুরু করলো।

আরো একটা বিষয়ে নিওক্লাসিকাল যুগ ইংরেজি তথা ইউরোপিয় সাহিত্যকে পিছিয়ে দিলো। ক্লাসিকসের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে নিওক্লাসিকাল যুগ কল্পনার জায়গা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে সংকুচিত করে ফেললো। সে সংকোচন এমনভাবে চলতে থাকলো যে শেষ পর্যন্ত কল্পনার বিপুল শক্তিধারী মানুষদেরকে এই চর্চার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নামতে হলো। সেই বিদ্রোহ থেকেই জন্ম নিলো রোমান্টিসিজম নামের নতুন সাহিত্যভাবনা বা সাহিত্যতত্ত্ব। আমাদের পরের আলোচনা এই রোমান্টিসিজম নিয়ে।

রোমান্টিসিজম

রোমান্টিসিজম শব্দটির উদ্ভব হয়েছে রোম (Rome) থেকে। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। একটি স্থান নাম থেকে কীভাবে শিল্প-সাহিত্য জগতের একটি দুনিয়াকাঁপানো তত্ত্বের নাম উদ্ভূত হলো? ব্যাপারটা একটু খোলাসা করা যাক। রোমে ব্যবহৃত ভাষার নাম ছিল ল্যাটিন। ল্যাটিন থেকে উদ্ভব হয়েছিল ইউরোপের অনেকগুলো ভাষার, যেমন: পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ফরাসি, ইতালিয়ান ইত্যাদি। এই সকল ভাষা আদতে রোমান ভাষা ল্যাটিন থেকে উদ্ভূত ছিল বলে এই সকল ভাষাকে এক নামে রোমান্স (Romance) ভাষা বলা হয়। একসময় এই ভাষাগুলোর সাহিত্যের অধিকাংশটা জুড়ে ছিল বীরপুরুষদের অবিশ্বাস্য অভিযাত্রার কাহিনি, অবাস্তবধর্মী জিনপরির গল্প

এবং বীরপুরুষ ও সতীসাধ্বীদের প্রেমের গল্প। ঐ ভাষাগুলোর সাহিত্যে এই জাতীয় গল্পের এমন প্রাবল্য ছিল যে, একসময় রোমান্স দ্বারা ঐ ভাষাগুলোকে যেমন বুঝাতো, তেমনই রোমান্স দ্বারা ঐ ভাষাগুলোয় লিখিত এই জাতীয় গল্পকেও বুঝাতো। আরো পরে, রোমান্স শব্দ দ্বারা ভাষাগুলোর চেয়ে বরং এই জাতীয় গল্পগুলোকেই বেশি করে বোঝানো শুরু হলো। সেই থেকে রোমান্স শব্দটি রোম নামক স্থানের অর্থবলয় থেকে সরে গিয়ে একটি সাহিত্যধারা বোঝানোর অর্থের দিকে চলে আসলো। রোমান্স মানে দাঁড়ালো একধরনের গল্প যাতে অবিশ্বাস্য এক বীরের গল্প থাকবে, সে গল্পে বীরের সাথে এক সতীসাধ্বীর প্রেমের বিষয় থাকতে পারে এবং সে গল্পে জিনপরি জগতের চরিত্ররাও থাকতে পারে।

সাহিত্যে এই রোমান্সের সময়কালটা মধ্যযুগীয়, অর্থাৎ রেনেসাঁস শুরুর আগের। ইংল্যান্ডের সাহিত্যে রোমান্সের আবির্ভাব হয়েছিল বলা যায় কিং আর্থার আর তাঁর দ্বাদশ নাইটকে ঘিরে। কিং আর্থার ছিলেন ৫ম শতকের আর তাঁকে নিয়ে ম্যালোরির রোমান্স লেখা হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে। তবে ইংরেজি ভাষায় রোমান্স অনেক পরে আসলেও ফরাসি, ইতালি ইত্যাদি ভাষায় এসেছিল দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে। 'চ্যানসন্স দে জেসতে', 'ইপোমাদোন', 'কিং হর্ন' ইত্যাদি রোমান্সের রচনাকাল দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতক। নিওক্লাসিকাল যুগে গ্রিক ও রোমান সাহিত্যের নিয়মকানুন এবং যুক্তিবুদ্ধির চর্চা সাহিত্যের আবশ্যিক বিষয় হয়ে উঠলে এসব মধ্যযুগীয় রোমান্স সাহিত্যের প্রতি মানুষের একধরনের তাচ্ছিল্য ও বিবমিষা সৃষ্টি হয়। 'রোমান্স' শব্দটার বিশেষণ রূপ 'রোমান্টিক' শব্দটি ইংরেজিতে আমরা প্রথম শুনতে পাই এই নিওক্লাসিকাল যুগেই। শব্দটি সেখানে যথেষ্ট নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির মতে শব্দটি লিখিতভাবে ব্যবহারের প্রথম রেকর্ড পাওয়া যায় ১৬৫০ সালে। সেই ব্যবহার থেকে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি উদ্ধৃত করছে: 'Being a history which is partly true, partly romantick, morally divine'। শব্দটি এখানে 'সত্য' শব্দের বিপরীতার্থবোধক 'শব্দ' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, রোমান্টিক মানে হলো মিথ্যা, কল্পিত, আজগুবি কিছু। ১৭৪০ সালের এক ব্যবহার থেকে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি শব্দটির আরেকটি ব্যবহার উদ্ধৃত করেছে: 'This Account, as Whimsical and Romantic as it is, was told to the Lady Cowper. . .by Dr Patrick'। এখানে শব্দটি খামখেয়ালি শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ রোমান্টিক মানে হলো যুক্তি বিবর্জিত।

রোমান্টিক অর্থ মিথ্যা, আজগুবি বা যুক্তিবিবর্জিত কেন? কারণ কি এই যে, 'রোমান্টিক'-এর বিশেষ্য রূপ 'রোমান্স' বলতে যে গল্পগুলো একসময় বোঝাতো সেগুলোতে শুধু আজগুবি, কল্পিত, যুক্তিবিবর্জিত, মিথ্যা কাহিনি থাকতো? সেটি আদি কারণ তা অনুমান করাই যায়। তবে সেই গল্প তো একসময় মানুষকে সাহিত্যের আনন্দ দিয়েছে। মানুষ তো আজগুবি আর কল্পনাশ্রিত বলে সে গল্প ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেগুলোকে মিথ্যার দায়ে বা যুক্তিহীনতার দায়ে অভিযুক্ত করেনি। তাহলে নিওক্লাসিকাল যুগে কেন শব্দটির সাহিত্যগত মর্যাদা ধূলিসাৎ করে এমন নেতিবাচক অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হলো? করা হলো এ কারণে যে, নিওক্লাসিকাল শিক্ষিত জগৎ ক্লাসিকাল যুগের যুক্তিবুদ্ধি চর্চাকে সাহিত্য ও সমাজ দুয়ের জন্যই আবশ্যিক করে তুলেছিল এবং যা কিছু যুক্তিবুদ্ধির ব্যত্যয় এবং কল্পনার আশ্রয়ে লালিত তাকেই মূর্খসুলভ ও পরিত্যাজ্য জ্ঞান করতে শুরু করেছিল।

কল্পনার এই অবদমনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই রোমান্টিকতা বা রোমান্টিসিজমের আবির্ভাব। কল্পনাশক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে ক্লাসিসিজম বা নিওক্লাসিসিজমের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের ঘোষণা সাহিত্যের তাত্ত্বিক জগতের বিশাল এক ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিলো। ক্লাসিসিজমের পক্ষে থাকুক বা বিপক্ষে থাকুক, প্লেটো-এরিস্টটলের মাইমেটিক থিয়রিকে এযাবৎ কেউ কোনোদিন চ্যালেঞ্জ করার সাহস করেনি। সবাই অবনত মস্তকে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে যে, সাহিত্য হলো জীবন ও জগতের অনুকরণ (imitation)। কিন্তু এতদিনের ক্লাসিকাল ও নিওক্লাসিকাল ধ্যানধারণাকে আমূল পাল্টে দিয়ে কল্পনার সৃজনী শক্তিকে অবলম্বন করে রোমান্টিকরাই প্রথম দুনিয়াকে জানাতে চাইলো যে, সাহিত্যের কাজ অনুকরণ (imitation) নয়, সাহিত্যের কাজ হলো সৃজন (creation)। শিল্পসাহিত্য বিষয়ে মাইমেটিক থিয়রিকে দুনিয়ায় এভাবেই প্রথম রোমান্টিকরা চ্যালেঞ্জ জানালো।

রোমান্টিকদের এই চ্যালেঞ্জের মূল শক্তি হলো কল্পনা। কল্পনা নিয়ে রোমান্টিসিজমের তাত্ত্বিকরা অনেক কথাই বলেছেন। তার মধ্যে খুব উদ্ধৃত করা হয় কোলরিজকে। তিনি *বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া* গ্রন্থে এ নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তাঁর মতে আমরা যাকে কল্পনা বলি তার পুরোটাই কল্পনা বা ইমাজিনেশন নয়। তিনি কল্পনার উদ্ভব ও কর্মপ্রক্রিয়ার পরিক্রমাটিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে দেখিয়েছেন এবং স্তরভেদে এদের ভিন্ন নামকরণ করেছেন। একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এর কাজের ভিন্নতাও দেখিয়েছেন। তাঁর মতে কল্পনার উদ্ভব প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপে রয়েছে স্মৃতি। স্মৃতি যা দেখে তাকে সময় পরম্পরায় সাজিয়ে রাখে। এরপরে মনের একপ্রকার কর্মপ্রক্রিয়ায় স্মৃতির বস্তুগুলো তাদেরকে সাজিয়ে রাখা সময়ের ও স্থানের তাক থেকে বের হয়ে এসে বর্তমান অভিজ্ঞতার সাথে মিলে মিশে একরকম নতুন নকশা তৈরি করে। মনের এই কর্মপ্রক্রিয়াও কল্পনা নয়, কোলরিজ এই স্তরের নাম দিয়েছেন ফ্যান্সি (The Fancy is indeed no other than a mode of Memory emancipated from the oder of time and space, while it is blended with and modified by . . . empirical phenomenon)। ফ্যান্সিকে কল্পনা হিসেবে নিয়ে অনেক কবিই ভুল করেছেন মর্মে কোলরিজ বলছেন। তিনি বলছেন ইংরেজ কবি কাউলি কল্পনার স্থলে ফ্যান্সি ব্যবহার করছেন, পক্ষান্তরে মিলটন যেটি ব্যবহার করছেন সেটি হলো কল্পনা। কোলরিজের মতে স্মৃতির বস্তু স্থান ও সময়ের ফোকর থেকে বের হয়ে এসে বর্তমানের অভিজ্ঞতার বস্তু বা ঘটনার ওপর আপতিত হয়ে মনে যে ভাব তৈরি করে সেটি কল্পনা। তবে এটি কল্পনার প্রাথমিক রূপ বা প্রথম ধাপ। এই কল্পনা কোলরিজের মতে প্রতিটি জ্যান্ত মানুষের আছে (prime agent of all human perception)। কবির কল্পনা বলতে যা বোঝায় তা এটিও নয়। কোলরিজের মতে কবির কল্পনা হলো কল্পনার দ্বিতীয় স্তর, বিকশিত স্তর। এ স্তরে মন তার কর্মপ্রক্রিয়ায় মনে জমিয়ে রাখা অন্য সকল বস্তু ও

অভিজ্ঞতার সাথে বর্তমান অভিজ্ঞতাকে জারিত করে, দ্রবীভূত করে, লীন করে দেয় এবং এসবের মাধ্যমে সৃষ্টি করে এক নতুনরূপ যা স্মৃতির বস্তুও নয়, কিংবা বর্তমান অভিজ্ঞতাও নয় (dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate)। রোমান্টিক তাত্ত্বিকদের মতে এটি হলো কল্পনা, তথা কবির কল্পনা।

এই কল্পনাকেই হয়তো মাইমেটিক থিয়রির মধ্যে থেকে লঞ্জাইনাস কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রোমান্টিকরা কল্পনার জোরে মাইমেটিক থিয়রি থেকেই বের হয়ে আসলেন। তাঁরা কল্পনার জোরে অনুকরণের পরিবর্তে সৃজনের প্রয়াসে নামলেন। কিন্তু এই শক্তি দিয়ে তাঁরা কী সৃজন বা সৃষ্টি করবেন? স্বাভাবিকভাবেই যা তাঁদের নেই তাই তাঁরা সৃষ্টি করবেন। যে জগৎ তাঁরা কল্পনায় দেখেন কিন্তু বাস্তবে যাপিত জীবনে খুঁজে পান না সেই রকম একটি আদর্শিক জগতের নির্মাণের প্রয়াসে তাঁরা তাঁদের কল্পনা শক্তিকে ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক। তাঁরা তাই করলেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, শেলী, কোলরিজ প্রমুখ দুনিয়ার শীর্ষ রোমান্টিক কবিরা সকলেই সেই সৃষ্টিকার্যে নামলেন। যাপিত জীবনের দুঃখ-জ্বরা, যন্ত্রণা-ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রত্যেকেই তাঁরা এক একটি আদর্শ জগৎ (ideal world) নির্মাণের প্রয়াসে নামলেন তাঁদের অপরিমিত কল্পনার শক্তি দিয়ে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেই আদর্শিক জগৎ নির্মাণ করতে চাইলেন প্রকৃতির সুষমা দিয়ে। তাই কখনো সে জগৎ তৈরি হলো টিনটার্ন এ্যাবের কাছে ওয়াই নদীর তীর ঘিরে, কখনো ড্যাফোডিল ফুল ঘিরে আবার কখনোবা মাইকেলের নিষ্কলুষ সাদামাটা গ্রামীণ জীবন ঘিরে। কীটসের সে জগৎ তৈরি হলো নাইটিঙ্গেলের গান ঘিরে বা শরতের ঐশ্বর্য ঘিরে। শেলীর সে জগৎ তৈরি হলো ওয়েস্ট উইন্ডের অপরিমেয় শক্তিকে ঘিরে। কোলরিজের ক্ষেত্রে হলো কুবলা খানের প্রমোদ-নিবাস ঘিরে। আমরা কথাগুলো বলছি এই কবিদের নির্দিষ্ট কিছু কবিতাকে অবলম্বন করে, কবিতাভেদে আমরা ভিন্ন বস্তুর কথাও বলতে পারতাম যাদেরকে ঘিরে তাঁদের আদর্শিক জগৎ নির্মিত হয়েছে।

রোমান্টিসিজিমের তত্ত্বের সাথে অঙ্গীভুত এই কল্পনা আর আদর্শিক জগতের ধারণার সাথে জড়িয়ে আছে রোমান্টিসিজম বিষয়ক আরো কিছু ধারণা ও অনুষঙ্গ। তার একটির নাম পলায়নপরতা (escapism)। রোমান্টিকরা বাস্তব জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবিচল কর্মতৎপরতার সাথে বীরের মতো কেনো জীবন যাপন করতে পারেন না বলেই তাঁরা কল্পনায় নির্মিত আদর্শিক জগতে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কল্পনার জগতে পালিয়ে তাঁরা একটু সাময়িক নিষ্কৃতি (momentary salvation) বা শান্তি লাভের চেষ্টা করে থাকেন। এগুলো রোমান্টিসিজমের অঙ্গীভুত ধারণা তবে ধারণাগুলো নেতিবাচক। 'পলায়নপরতা' বা 'সাময়িক নিষ্কৃতি'- এর কোনোটিই রোমান্টিসিজমের জন্য কোনো সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য নয়।

এর আরো একটি সমালোচনার দিক হলো রোমান্টিকদের পুরো বিষয়টাই মারাত্মকভাবে 'আমি'ময়। রোমান্টিকরা সর্বত্রই 'আমার' জগৎ আর 'আমার' শান্তি নিয়ে ভাবিত। সবটুকু বস্তুজগৎকে একজন রোমান্টিক কবি তাঁর সত্ত্বায় লীন করে তারপরে বুঝতে শেখেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করেন। 'আমি-তুমি'ময় রোমান্টিক কবিতাগুলোতে যে 'তুমি' রয়েছে তা-ও মূলত 'আমি' দ্বারা কল্পিত আর নিয়ন্ত্রিত এক 'তুমি'। 'আমি'র বাইরের পুরো বস্তুজগৎকেই রোমান্টিক কবি দেখেন এইভাবে। আর যখন তিনি শুধু 'আমি'র রূপকে দেখেন তখন সব বস্তুজগৎ ও বস্তুসত্যকে অস্বীকার করে দেখেন শুধু আত্মার রূপ, শোনেন শুধু আত্মার ধ্বনি। তখন বস্তুজগৎই আর তাঁর চেতনায় থাকে না। যাপিত জীবনের বাস্তবতার বাইরের এক সুদূর আধ্যাত্মিকতার রাজ্য ছাড়া তাঁর নির্মাণ থেকে তখন আর কিছুই পাওয়া যায় না। বিশশতকের তাত্ত্বিকরা সাহিত্যের তথা লেখক ও কবির 'আমি'ময়তা থেকে সরে দাঁড়াতে কী বললেন সেই আলোচনায় আমাদের পরের অধ্যায় 'নিউ ক্রিটিসিজম'।

নিউ ক্রিটিসিজম

'নতুন সমালোচনা'র শুরুটা হয়েছিল ঠিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত সমালোচনা সাহিত্যের বড় দুটো ঐতিহ্য ছিল: একটি ক্লাসিসিজম, আরেকটি রোমান্টিসিজম। ধারা দুটো পরস্পর বিরোধী হলেও, দুই ধারায়ই লেখার রূপরস সংক্রান্ত এযাবৎকালের ঐতিহ্য, লেখক, লেখা জুড়ে লেখকের 'আমি'ময় উপস্থিতি, লেখকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা, লেখকের মানস ও ব্যক্তিত্ব এবং বাস্তবতা ও প্রকৃতির সাথে তাঁর ও তাঁর লেখার সম্পর্ক অনেক গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতো। লেখকের সৃষ্টিশীলতায় ও পাঠকের সমঝদারিত্বে উভয়েরই তখন এক দীর্ঘ ঐতিহ্য আর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই উত্তরাধিকারকে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দিলো। মানুষ এককোটি মানুষকে মেরে ফেললো। যারা মারলো তারাও শিক্ষিত, লিটারেট; আর যাদেরকে মারলো তারাও শিক্ষিত, লিটারেট। জ্ঞান, বিদ্যা, রুচি, সুকুমারবৃত্তি এবং এতকালের অপরাপর শ্রদ্ধাব্যঞ্জক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারগুলো ভেঙ্গেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মানুষ অনুভব করলো এক নিঃস্ব একাকিত্ব। তার পাশে যারা এখনো বেঁচে আছে তারাও মানুষ কি-না সংশয় দেখা দিলো। এই অবস্থার বর্ণনায় জার্মান দার্শনিক ওয়াল্টার বেনিয়ামিন (Walter Benjamin) তাঁর 'দি স্টোরিটেলার' গ্রন্থে লিখলেন- 'মানুষ যুদ্ধ থেকে ফিরলো নিস্তব্ধতাকে সাথে নিয়ে- মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের আগের ক্ষমতা তখন আর তার নেই' (Men returned from the battlefield grown silent- not richer but poorer in communicable experience)। একই গ্রন্থে বেনিয়ামিন যুদ্ধপরবর্তী মানুষের শিকড়চ্যুত অবস্থাটি আরো করুণভাবে বর্ণনা করলেন- 'অতীতের যে অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে মানুষ দুনিয়ার অন্য মানুষের সাথে যোগাযোগটি রক্ষা করতো এবং যে অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে মানুষ বুঝতে চেষ্টা করতো দুনিয়ার অপরাপর জিনিস, সেই অভিজ্ঞতার বুনিয়াদটি ধ্বংস হয়ে গেল। একটি প্রজন্ম যারা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে

স্কুলে যেতো যুদ্ধের পরে তারা নিজেদেরকে খুঁজে পেলো কোনো এক পাড়াগাঁয়ের খোলা আকাশের তলে যেখানে আগের কিছুই আর আগের মতো নেই, একমাত্র আকাশের মেঘগুলো ছাড়া। সেই মেঘের নিচে জমিনের ধ্বংসযজ্ঞ আর বিস্ফোরণের মাঝে পড়ে থাকলো সেই প্রজন্মের মানুষগুলোর বিধ্বস্ত ও শিকড়চ্যুত মনুষ্য শরীরগুলো।' 'নতুন সমালোচনা' ছিল এই বিধ্বস্ত ও শিকড়চ্যুত মানুষগুলোর সাহিত্যের সাথে পুনঃসংযুক্ত হওয়ার এক নতুন সমালোচনাতাত্ত্বিক প্রয়াস।

এই প্রয়াস দুই মহীরুহের চিন্তা ও কর্ম থেকে দুইভাবে সাধিত হয়েছে। দুই মহীরুহের একজন হলেন টি. এস. এলিয়ট এবং অপর জন হলেন আই. এ. রিচার্ডস। টি. এস. এলিয়ট জন্মেছিলেন আমেরিকায় কিন্তু জীবনের বেশির ভাগ অতিবাহিত করেছেন ইংল্যান্ড ও ইউরোপে। বিপরীতে আই. এ. রিচার্ডস জন্মেছিলেন ইংল্যান্ডে কিন্তু জীবন কাটিয়েছেন আমেরিকার হার্ভার্ডে অধ্যাপনায়। 'নতুন সমালোচনা'র বিকাশে দুজনেরই অপরিহার্য অবদান থাকলেও, সেখানেও একই তত্ত্বের ভিতরে দুজন হেঁটেছেন দুই ভিন্ন পথে। বিধ্বস্ত ও শিকড়চ্যুত মানুষগুলোকে সাহিত্যের সাথে পুনঃসংযুক্ত করার সমালোচনাতাত্ত্বিক প্রয়াসে টি. এস. এলিয়ট ঠিক করেছিলেন যে, তিনি এই লোকগুলোকে আবার তাদের হারানো ঐতিহ্যের সাথে জুড়ে দিবেন। এই চিন্তায় তিনি তাঁর 'ট্রাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট' নামের বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে অনেক জটিল করে 'ঐতিহ্য' বা 'ট্রাডিশন' সংক্রান্ত ধারনার বয়ান দিলেন। আর এই ঐতিহ্যের ভিত্তি গড়তে বলে দিলেন যে এর মধ্যে লেখককের 'আমি'ময়তার কোনো অংশ থাকতে পারবে না। আর আই. এ. রিচার্ডস ঠিক করলেন যা হারিয়ে গেছে তার দিকে আর ফিরে যাওয়া নয়, বরং নিবদ্ধ হতে হবে শুধু যা আছে তার মধ্যে। তাই তিনি চাইলেন আমাদেরকে নিবদ্ধ হতে হবে শুধু টেক্সটের মধ্যে। ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি, লেখকের জীবন, তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর 'আমি'ময়তা ইত্যাকার কোনো প্রসঙ্গের অধীন করে টেক্সটকে বোঝার সকল চেষ্টা পরিহার কতে হবে।

টি. এস. এলিয়ট ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি বললেও, সে ঐতিহ্য যাতে কোনোভাবেই পূর্ববর্তী রোমান্টিকদের ঐতিহ্যকে না বোঝায় সে জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি করলেন। ঐতিহ্যের সাথে সংযোগের যে উপায় তিনি বললেন তাঁর মাধ্যমে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিকধারার সকল ঐতিহ্যকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন যে, এই ঐতিহ্যিক চেতনা অর্জন করতে হলে কবির 'আমি'কে বিসর্জন দিতে হবে বস্তু ও ঐতিহ্যের কাছে। কবির 'আমি' বলে তাঁর লেখার মধ্যে কিছু থাকতে পারবে না। লেখকের বিকাশ ও উন্নয়ন নির্ভর করবে লেখক কতখানি তাঁর 'আমি'কে হত্যা করতে পারবে সেই যোগ্যতার উপরে। (The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality)। তিনি আরো বলেন যে, লেখা বা সাহিত্য লেখকের 'আমি'কে প্রকাশের কোনো জায়গা নয়, বরং 'আমি' থেকে পলায়নের জায়গা। ('the poet has, not a "personality" to express'; 'Poetry is not . . . the expression of personality, but an escape from personality')। টি. এস. এলিয়টের এই সকল কথাই হলো রোমান্টিক ধারার ট্রাডিশন বা ঐতিহ্যের উপরে এক একটি কুঠারাঘাত। রোমান্টিক ট্রাডিশন অনুযায়ী সাহিত্য ও কলা সব সময়ই 'আমি'ময়। ট্রাডিশনের দিকে ফেরত গিয়ে আবার রোমান্টিক ট্রাডিশনকে এভাবে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে টি. এস. এলিয়টও তাঁদের 'নতুন সমালোচনা'য় মূলত আই. এ. রিচার্ডসের দিকেই ফিরলেন। 'ট্রাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট' প্রবন্ধের দ্বিতীয় সেকশনে এসে তিনি সরাসরি বললেন- 'সত্যিকার সমালোচনা এবং বাস্তব মূল্যায়নের লক্ষ্যবস্তু হবে কবিতা, কোনোভাবেই কবি এদের লক্ষ্যবস্তু নয়' (Honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry)। এভাবেই টি. এস. এলিয়টের হাতে শুরু হওয়া নতুন সমালোচনা ধারা বলতে চাইলো যে, কোনো সাহিত্যকর্মের সমালোচনায় ঐ কর্মের লেখকের জীবন, দর্শন ও সময়কে টানার প্রসঙ্গ থাকবে না। সাহিত্যকর্মকে সর্বতোভাবে লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিবেচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে।

আই. এ. রিচার্ডস এই বিচ্ছিন্নকরণে টি. এস. এলিয়টের চেয়েও অগ্রসর একথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি তাঁর অধ্যাপনাকর্মের অংশ হিসেবেই এক অভিনব কর্ম করেছিলেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের কাছে কবিতা তুলে দিয়েছিলেন সেগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য। এই কবিতাগুলো তিনি দিতেন কবির নাম এবং কবিতার নাম ছাড়া। এছাড়াও কবিতাগুলো তিনি নির্বাচন করতেন এমনভাবে যাতে সেগুলো কোনো জনপ্রিয় কবিতার সংকলনের অন্তর্ভুক্ত না হয়, যাতে সেগুলোতে স্থান ও সময়ের কোনো উল্লেখ না থাকে এবং শিক্ষার্থী যাতে বুঝতে না পারে এগুলো কোন যুগের এবং কার লেখা হতে পারে। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে আরো বলে দিতেন যে, তারা তাদের লিখিত সমালোচনার কাগজে তাদের নাম যেন উল্লেখ না করে। এইভাবে প্রাপ্ত আলোচনাগুলোর বিশ্লেষণ দিয়েই তিনি রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রাকটিকাল ক্রিটিসিজম' এবং এই গ্রন্থটিকেই বলা যেতে পারে 'নতুন সমালোচনা' নামক ধারার প্রবর্তক গ্রন্থ।

এই কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি যে ফলাফল লাভ করেছিলেন তা ছিল সাংঘাতিক। প্রাপ্ত আলোচনাগুলো নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখলেন- 'অকপটে স্বীকার করছি যে, কবিতা হাতে নিয়ে তার আলোচনায় দশ জনের মধ্যে নয় জন বলে এমন কিছু যা ঐ কবিতার কোনো প্রসঙ্গই নয়; বরং যা বলে তা স্বভাবজ ভদ্রতা থেকে উদ্ভূত, অথবা কোনো অজ্ঞাত রাগ থেকে উদ্ভূত, অথবা সামাজিক চর্চার ধারা থেকে উদ্ভূত। এই সব আলোচনায় যে সমালোচনার পাঁচালি তৈরি হয় সেগুলোকে সমালোচনা নাম না দিয়ে বরং সামাজিক আলাপচারিতা (social gesture) নাম দিলেই ভালো হয়।' আই. এ. রিচার্ডস সাহিত্যের সমালোচনার নামে এই সামাজিক আলাপচারিতার ধারাকে রুখতেই নেমেছিলেন। এই ধারা রুখে তিনি যে নতুন ধারা প্রবর্তনের প্রয়াস পেলেন ১৯৪১ সালে তাঁর ছাত্র জন ক্রো র‍্যানসম (John Crowe) তার নাম দিলেন 'নতুন সমালোচনা' (New Criticism)।

'নতুন সমালোচনা' নামের এই ধারা প্রবর্তনে আই. এ. রিচার্ডসের দুটো বই ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একটি 'প্রাকটিকাল ক্রিটিসিজম', এবং অপরটি 'দি প্রিন্সিপলস অব লিটারারি ক্রিটিসিজম'। এই দুই বইয়ের বক্তব্য অনুযায়ী একটি কবিতা বা সাহিত্যকর্ম পাঠ ও সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হলো ঐ কবিতার কালো অক্ষরগুলোর মধ্যে বিধৃত নেই এমন সবকিছু মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা। এরপর মস্তিষ্কটিকে সম্পূর্ণভাবে ঐ কবিতার শব্দগুলোর মধ্যে নিবদ্ধ করে কবিতাটির এক নিবিড় পাঠ (close reading) নিশ্চিত করা। নিবিড় পাঠের সময় মনে রাখতে হবে যে, কবিতার ভাষা নির্দেশাত্মক (referential) নয়, বরং অন্তর্মুখী ভাবাত্মক (emotive)। কবিতার শব্দের অর্থ বস্তুতে নয়, ভাষার বাইরে নয়; বরং তার অর্থ ভাষার ও চেতনার অভ্যন্তরে। তাই ভাষাকে চেতনায় ও আবেগে অন্তর্বয়ন করে সে অর্থকে খুঁজে পেতে হবে চিন্তারাজ্যে; বস্তু ও তথ্যরাজ্যে নয়। চিন্তারাজ্যে সাহিত্যকর্মটিকে পৌঁছানোর উপায়স্বরূপ ইমোটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের সকল কারিগরি সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে। সে-সব কারিগরির মধ্যে রয়েছে সাহিত্যকর্মটির কাঠামোগত ধারণা, রয়েছে ছন্দ ও অলঙ্কারের সকল ধারণা। এইসব কবিতার অন্তর্গত ধারণার সহায়তায় নিবিড় পাঠ পাঠককে পৌঁছে দিবে কবিতাটির অর্থের জায়গায় এবং এর নন্দনের জায়গায়। অল্প কথায় এই হলো এলিয়ট ও রিচার্ডস প্রবর্তিত নতুন সমালোচনার সার কথা।

এই সমালোচনা পদ্ধতির একটি বড় সমালোচনা হলো এই যে, এখানে লেখক কী বলতে চেয়েছেন এটা আমলে নেয়া হয় না, যেহেতু এই সমালোচনার ধারায় পাঠককে বলা হয় যে, লেখক কে তা তার জানার দরকার নেই। লেখকের পরিচয়, তাঁর মতাদর্শ, তাঁর ধর্ম ও বর্ণ, তাঁর সমাজ ও সংসার কিছুই তাঁর লেখা বিচারের জন্য প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত নয়। এ পদ্ধতির এই আপাতদৃষ্ট দুর্বলতার বিষয়টিকে এ পদ্ধতির একটি বড় সবলতা হিসেবে পরবর্তীতে প্রমাণ করেছেন আই. এ. রিচার্ডসের যোগ্য ছাত্র উইলিয়াম এম্পসন (William Empson) তাঁর 'দি সেভেন টাইপস অব এ্যাম্বিগুইটি' নামের বিখ্যাত গ্রন্থে। এ গ্রন্থের আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, সাহিত্য সমালোচনায় লেখকের উদ্দিষ্ট অর্থকে খোঁজার মানে হলো সাহিত্যকর্মটির অর্থের বিশালতা ও বহুত্বকে গলা টিপে হত্যা করা। সাহিত্যকর্মটি পাঠ কালে যত দ্ব্যর্থবোধকতা বা অর্থের কুহক বের হবে ততই টেক্সটটির অর্থের নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। এভাবেই সাহিত্যকর্মটি নতুন অর্থের দ্বার উন্মুক্ত রেখে চিরকালীন একটি আবেদন তৈরি করবে। লেখকের অর্থের নির্দিষ্টতা পাঠকের অন্বেষণের লক্ষ্য হলে সে অর্থ খুঁজে পাওয়ার পরে টেক্সটটির আর নতুন কিছু দেয়ার থাকবে না। এটা হবে টেক্সটটির একধরনের মৃত্যু। নতুন সমালোচনা এভাবে সাহিত্যকর্মকে অনেক অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে। উইলিয়াম কে. উইমসাট এই বক্তব্য আরো পাণ্ডিতিকভাবে দাঁড় করিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত দুই প্রবন্ধেঃ একটির নাম The Intentional Fallacy, অপরটির নাম The Affective Fallacy। 'নতুন সমালোচনা' তত্ত্ব নামের এই তত্ত্বে রিচার্ডস, এম্পসন, উইমসাট সকলেরই খুব প্রত্যয়দীপ্ত ও প্রমাণিত বক্তব্য হলো সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে ও বিচারে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর ধর্ম, বর্ণ, আদর্শ ইত্যাদিকে টানা হলে তা হবে সাহিত্যকর্মটির জন্য তথা সাহিত্যজগতের জন্য একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিধনযজ্ঞের প্রয়াস। লেখককে না টেনে শুধু লেখাকে উপজীব্য করে সমালোচনার এই ধারা আরো নতুন নতুন চিন্তায় আর ধারণায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে তা ফরমালিজম বা আঙ্গিকবাদ নামে অনেকদিন ধরে সমালেচনার রাজ্যে রাজত্ব করে বেড়ায়।

ফরমালিজম বা আঙ্গিকবাদ

ফরমালিজম বা আঙ্গিকবাদ শুরুতে শুধু ফরমালিজম নামে পরিচিত ছিল না। সাথে এক বিশেষণ যোগ করে এর নাম দেয়া হয়েছিল রাশিয়ান ফরমালিজম। রাশিয়ান ফরমালিজমের সূত্রপাত ঘটেছিল রাশিয়ার দুই শহরের দুই গ্রুপ বুদ্ধিজীবীকে কেন্দ্র করে। একগ্রুপ থাকতেন মস্কোতে, আর এক গ্রুপ থাকতেন পেট্রোগ্রাদে যার বর্তমান নাম সেন্ট পিটার্সবুর্গ। এই দুই গোষ্ঠির ভাবনাচিন্তার শুরুটা ১৯১৫-১৬ এর দিকে। তাদের ভাবনার মূল কেন্দ্রে ছিল সাহিত্য কোন গুণে সাহিত্য হয় তার অন্বেষণ। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে বের করা যার দ্বারা সাহিত্যকে অসাহিত্য থেকে আলাদা যায়। রোমান ইয়াকবসন বললেন- 'সাহিত্য বিষয়ক সমঝদারিত্ব মানে সাহিত্যের সামগ্রিক জ্ঞান নয়, বরং সাহিত্যের সেই গুণ সম্পর্কিত বোধ বা জ্ঞান যা কোনো লেখাকে সাহিত্য পদবাচ্য করে'। এই বিষয়ে তাঁরা তিনটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট স্পষ্ট করলেন। ক) কোনো লেখার মৌলিক সাহিত্যগুণটির সাথে ঐ লেখার লেখক, লেখার প্রসঙ্গসূত্র বা লেখার বিষয়বস্তু কোনোটিই আবশ্যিকভাবে সম্পৃক্ত নয়। খ) কোনো লেখার মৌলিক সাহিত্যগুণটির উৎস হলো ঐ লেখার ভাষা। গ) কোনো লেখার ভাষার নির্দিষ্ট কাঠামো বলে দিবে যে, লেখাটি সাহিত্যপদভুক্ত না কি অন্যবিধ কিছু; অর্থাৎ সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হতে হলে ভাষাটির কাঠামো হবে এমন যা অসাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না। তিন পয়েন্টের বক্তব্য একত্র করে বলা যায়, একটি কবিতা কবিতা নয় একারণে যে, তার লেখক একজন কবি, কিংবা তার প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তুটি কাব্যিক বরং কবিতাটি কবিতা এ কারণে যে, তা একটি বিশেষ ভাষাকাঠামোতে বা ভাষাবিন্যাসে লিখিত। আরো সোজা কথায় কবিতাটি তার শব্দগুলোর বিশেষ বুননের কারণে কবিতা।

শব্দের এই বিশেষ বুনন বা ভাষার এই বিশেষ কাঠামোটি কী যা একটি লেখাকে সাহিত্য করে তোলে সে বিষয়ে দুজন প্রতিনিধিত্বমূলক তাত্ত্বিকের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁরা হলেন ভিক্তর শ্‌ক্লোভস্কি (Viktor Shklovsky) ও রোমান ইয়াকবসন (Roman Jakobson)। দুঃখজনকভাবে তাঁদের কথাবার্তা তাঁরা যখন বলেছেন তখন সে কথাবার্তা রাশিয়ায় তেমন কোনো গুরুত্ব পায়নি, কারণ তখনকার বিপ্লব-পরবর্তী সরকার তাঁদের এই কথাবার্তা ও চিন্তার বিরোধী ছিল। ফলে তাঁদের কথাবার্তা গুরুত্ব অর্জন করেছে অনেক পরে, ১৯৬০ এর দশকে। এই দুই তাত্ত্বিকের প্রথম জনের অর্থাৎ ভিক্তর শ্‌ক্লোভস্কির (১৮৯৩-১৯৮৪) সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়া হলো ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন (defamiliarisation)। তাঁর 'আর্ট এ্যাজ টেকনিক' প্রবন্ধে তিনি বলেন: 'আমরা যদি আমাদের অনুভবের সাধারণ নিয়মগুলো নিরীক্ষা করি আমরা দেখবো যে, কোনো অনুভব অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে তা এতটা স্বয়ংক্রিয় হয়ে যায় যে, তার মধ্যে আর অনুভব থাকে না'। শ্ক্লোভস্কি বলতে চান যে, অতিপরিচিতির জন্য অনুভবের এই মরে যাওয়াকে সাহিত্য রোধ করে। আর এই মরে যাওয়াকে রোধ করতে সাহিত্য অতিপরিচিত অনুভব বা অভিজ্ঞতাকে অপরিচয়ের নতুনত্ব দান করে। শ্ক্লোভস্কি সাহিত্যের এই আবশ্যিক কাজের নাম দিয়েছেন ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন (defamiliarisation)। তাঁর মতে সাহিত্যের ভাষা অপরিচিতকরণ প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে এমন এক অপাপবিদ্ধ অবস্থায় (state of innocence) নিয়ে যায় যেন এর আগে সংশ্লিষ্ট অনুভব বা অভিজ্ঞতাটি আমাদেরকে স্পর্শই করে দেখেনি।

শ্ক্লোভস্কি তাঁর আলোচিত ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন বা অপরিচিতকরণ বিষয়ক ধারণাকে ব্যবহার করে 'কাহিনি' (story) এবং 'প্লট' এর মধ্যকার পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'স্টোরি' হলো কতগুলো ঘটনার ধারাবাহিক বয়ান যা সত্যিকারে সাহিত্য নয়। কাহিনি সাহিত্য হয় প্লটের মধ্য দিয়ে আর এজন্য প্রয়োগ করতে হয় ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন বা অপরিচিতকরণ বিষয়ক কারিগরি। এই কারিগরিতে কাহিনিটি ধীরে ধীরে পরিচয়ের আড়ালে চলে যায় এবং প্লট রূপে আবির্ভূত হয়। শ্ক্লোভস্কির এ কথাটা কিছুটা ধোঁয়াশা হলেও কাহিনিকে প্লটে রূপান্তরের মাধ্যমে এর সাহিত্যায়ন এবং সে কর্মে ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশনের ব্যবহার শ্ক্লোভস্কির খুব পরিচিত একটি কথা। এর উদাহরণ দেয়া হয়ে থাকে জোসেফ কনরাডের 'হার্ট অব ডার্কনেস' উপন্যাসের মাধ্যমে। এ উপন্যাসে উপনিবেশের চেনা গল্পটি ডিফ্যামিলিয়ারাইজ করা হয়েছে। ইউরোপ জুড়ে উপনিবেশের চেনা গল্পটি বলে যে, উপনিবেশের কাজ হলো আফ্রিকা ও এশিয়ার বর্বর ও অন্ধকার জগতে ধর্মের ও সভ্যতার আলো ছড়ানো। 'হার্ট অব ডার্কনেস' উপন্যাসটি যখন ধীরে ধীরে দেখায় কীভাবে কঙ্গোতে বেলজিয়ানরা সে আলো ছড়াচ্ছে তখন পাঠক আবিষ্কার করে আলো ছড়ানোর আসল রূপটি। সে আসল রূপের মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে, ইউরোপিয়রা সেখানে আলো ছড়াচ্ছে না বরং নিজেরাই নিজেদের সব আলো গিলে ফেলে বর্বরতার জঘন্য রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। উপনিবেশের এই নতুন রূপ গল্পে পরিবেশিত হয়েছে ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশনের মাধ্যমে এবং ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশনের সুবাদেই গল্পটি সাহিত্য পদভুক্ত হতে পেরেছে। আঙ্গিকবাদ যদিও রাজনীতিকে সাহিত্য থেকে সরিয়ে ভাবে, তারপরও দেখা যাচ্ছে 'হার্ট অব ডার্কনেস'-এর বিশ্লেষণে আঙ্গিকবাদেও সেই রাজনীতি এসেই গেল।

এবার শ্ক্লোভস্কি থেকে চোখ ফেরানো যাক রোমান ইয়াকবসনের (১৮৯৬-১৯৮২) দিকে। তিনি ছিলেন আঙ্গিকবাদের মস্কো গোষ্ঠির নেতা। রাশিয়ার বিপ্লব-পরবর্তী সরকারের নিপীড়নের যুগে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগে হিজরত করেন। সেখানে তিনি আঙ্গিকবাদের প্রাগ গোষ্ঠি তথা প্রাগ স্কুলের নেতা রূপে আবির্ভূত হন। পরে ইহুদি বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে নাৎসী অত্যাচারের সময় তিনি আমেরিকায় চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নেন। আঙ্গিকবাদী হিসেবে তাঁর ভাবনারও মূল কথা হলো সাহিত্য কেন সাহিত্য হচ্ছে তা খুঁজতে হবে তার ভাষার মধ্যে। তবে সাহিত্যের ভাষার কাজ ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন না বলে তিনি বলতে চাইলেন সাহিত্যে ভাষার কাজ হলো কাব্যিকীকরণ। এই কাব্যিকীকরণের বিষয়ে ইয়াকবসন ব্যবহার করেছেন 'সমতার ধারণা' বা notion of equivalence। ধারণাটি একটু পেঁচানো। আমরা একটু বেশি সোজা করে বলতে চাই। একটা উদাহরণের মাধ্যমে আগানো যাক। ধরা যাক দুটো বাক্য: ক) ফুল ফোটে, ও খ) বাল্ব জ্বলে। এখানে ফুলের ফোটার আর বাল্বের জ্বলার মাঝে একটি সমতার সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে কথাটি যদি বলা হয় বাল্বটি ফুল হয়ে উঠছে কিংবা ফুলটি বাল্ব হয়ে জ্বলছে তাহলে ভাষাটি কাব্যিক হয়ে ওঠে, তার গা থেকে নিত্যদিনের ব্যবহারের ধূলিময়লা ঝরে যায়। ইয়াকবসনের এই ধারণা আর শ্ক্লোভস্কির ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন অনেকটা একই ধারণা। শুধু টার্ম আলাদা। স্বল্প পরিসর এ আলোচনায় আঙ্গিকবাদ সম্পর্কে আমরা এটুকুই বলতে চাচ্ছি যে, সাহিত্যতত্ত্বে আঙ্গিকবাদের একমাত্র বিষয় হলো সাহিত্যকর্মের ভাষার বিশ্লেষণ। সাহিত্য মানে সবটুকুই ভাষার কারিগরি। আমরা এর পরের আলোচনায় আসবো বাখতিনকে নিয়ে যিনিও একজন আঙ্গিকবাদী, তবে তিনি অনেক নতুন কথা বলেছেন যা ফরমালিজম বা আঙ্গিকবাদের বাইরে স্বতন্ত্র সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবেই অধীত হয়। আমরা এর নাম দিতে চাই বাখতিনিজম।

বাখতিনিজম

মিখাইল বাখতিনের জন্ম হয়েছিল ১৮৯৫ সালের ৪ নভেম্বর রাশিয়ার ওরিয়ল এলাকায়। তবে তিনি বড় হন ভিলনিয়াস ও ওডেসা শহরে। এই দুই শহরই ছিল বহু ভাষার শহর। ভিলনিয়াস শহরে রাশিয়ান ভাষা ছিল সরকারি ভাষা। কিন্তু এখানকার মানুষেরা লিথুয়ানি ও পোলিশ ভাষায় অহরহ কথা বলতো। একইভাবে বন্দরনগরী ওডেসাতে জার্মান, পোলিশ, রাশিয়ান ইত্যাদি বহু ভাষার ব্যবহার ছিল। এই বহু ভাষার মাঝে বাখতিনের বেড়ে ওঠা পরবর্তী জীবনে তাঁর মাঝে 'বহুভাষিকতা'র তাত্ত্বিক চিন্তা জাগ্রত করেছিল বলে বাখতিন বিশেষজ্ঞ মাইকেল হলকুইস্ট দাবি করেছেন। বাখতিনের লেখাপড়া নিয়ে অনেক কথা চালু আছে। তবে এখন একথাই মানুষ জোরেশোরে বলছে যে, তিনি স্কুল পেরিয়ে আর খুব একটা পড়াশোনা চালাননি। যে সার্টিফিকেটগুলো বাখতিনের লেখাপড়া বিষয়ক প্রমাণ হিসেবে চালানো হয় সেগুলো মূলত তাঁর নয়, বরং তাঁর বড় ভাইয়ের। উচ্চতর লেখাপড়া না থাকলেও বলশেভিক বিপ্লবের পরে একটা বুদ্ধিজীবী শ্রেণির কেন্দ্রে তিনি জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ভ্যালেন্তিন ভোলোশিনোভ (Valentin Voloshinov) ও পাভেল মেদভেদেভ (Pavel Medvedev) এর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতেরা। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় বাখতিনের

বিখ্যাত প্রবন্ধ Problems of Dostoivsky's Poetics। এই বছরই বাখতিন গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে কাজাখস্তানের এক দূরবর্তী অঞ্চলে নির্বাসন দেয়া হয়। এই নির্বাসনকলীন সময়টা বাখতিনের জীবনের খুব ফলপ্রসূ একটা সময়। এসময় তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাসের ওপর সমালোচনাতাত্ত্বিক কাজ করেন। এই লেখাগুলো নিয়ে পরবর্তীতে তৈরি হয় তাঁর বই The Dialogic Imagination। ১৯৩০ এর দশকের শেষে আর চল্লিশের দশকের শুরুতে তিনি সম্পন্ন করেন আরো দুটো কাজ- A Study on Bildungsroman এবং Rabelais and His World। প্রথম বইটি যে প্রকাশককে ছাপতে দেয়া হয়েছিল তাদের ছাপাখানায় পাণ্ডুলিপিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোম্বিংয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর নিজের কাছে যে কপিটি ছিল তা তিনি সিগারেট পেপারের অভাবে সিগারেটের তামাক মোড়ানোর কাজে প্রায় পুরোটা ব্যবহার করে ফেলেন। Rabelais and His World মূলত তাঁর থিসিস যেটি তিনি ম্যাক্সিম গোর্কি ইনস্টিটিউটে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য সাবমিট করেছিলেন। এটিই বাখতিনের সমালোচনা তত্ত্বে একটি বড় কাজ হিসেবে পরে পরিগণিত হয়েছে। বাখতিনের এসব কাজের কিছুই ১৯৬০ এর দশকের আগে খুব একটা কারো চোখে পড়েনি। ৬০ এর দশকেই দুনিয়ার মানুষ সত্যিকারে বাখতিনকে প্রথম আবিষ্কার করে। ততদিনে এক জাতীয় হাড়ের ক্ষয় রোগে তিনি একটি পা হারিয়েছেন। এই পা-হারানো মানুষটি যিনি ছিলেন এক মফস্বল শহরের গরিব জার্মান শিক্ষক তিনি হঠাৎ ১৯৬০ এর দশকে রাশিয়ায় বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিক মহলে এক গুরু হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি মস্কো এসে বাস করতে শুরু করেন। তাঁর পুরনো লেখাগুলো নতুন প্রাণ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে একাডেমিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে। ১৯৭৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে এই লেখাগুলোর বেশিরভাগ বই আকারে প্রকাশিত হতে শুরু করে। আশির দশকে সারা দুনিয়ায় বাখতিন এক কিংবদন্তিতে পরিণত হন।

বাখতিন তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে দুনিয়াকে কয়েকটি নতুন ও মৌলিক ধারণা দান করে গেছেন। আমরা এখানে তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় মূলত ঐ ধারণাকটির সাথেই শুধু পরিচিত হতে চেষ্টা করবো। প্রথমেই বলবো তাঁর প্রদত্ত **Polyphony (বহুস্বর)** নামক ধারণাটির কথা। পলিফোনি মূলত সঙ্গীততত্ত্বের একটি শব্দ। বিভিন্ন স্বরের ঐকতানিক সুরকে সঙ্গীতে পলিফোনি বলা হয়। বাখতিন তাঁর Problems of Dostoivsky's Poetics প্রবন্ধে এই শব্দটিকে ধার করলেন সঙ্গীতের জগৎ থেকে এবং বললেন যে, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর পলিফোনি বা বহুস্বর (We consider Dostoevsky one of the greatest innovators in the realm of artistic form. He created, in our opinion, a completely new type of artistic thinking, which we have provisionally called *polyphonic*)। পলিফোনি বলতে বাখতিন কী বুঝিয়েছেন তা তিনি ঐ প্রবন্ধেই কিছুক্ষণ পরে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যামতে পলিফোনি হলো পারস্পরিকভাবে অন্তর্লীন নয় এমন স্বাধীন স্বর ও চেতনার বহুত্ব (A plurality of independent and unmerged voices and consciousnesses)। পলিফোনি তখন অর্জিত হবে যখন চরিত্রসমূহ লেখকের চেতনার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত না হয়ে বরং তারা নিজ নিজ চেতনার সমগ্রতাকে ধারণ করে আখ্যানের অপরাপর চরিত্রের সাথে মিশে যেতে পারবে। যে লেখায় লেখকের একক চেতনা বিভিন্ন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে অর্থাৎ যে লেখায় লেখকের সিঙ্গেল অথরিয়াল কনশাসনেস রয়েছে সেটিতে পলিফোনি অর্জিত হয়নি। পলিফোনি অর্জিত হয়েছে এমন সাহিত্যে চরিত্ররা লেখকের ডিসকোর্সের বিষয়বস্তু (object of discourse) হলেও, একই সাথে ডিসকোর্সটিতে ঐ চরিত্ররাই বিষয়ী (subject of discourse)।

বাখতিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোনো একটি সাহিত্যকর্মে অনেক চরিত্র এবং তাদের অনেক স্বর থাকাই সাহিত্যকর্মটিকে পলিফোনিক করে তোলে না। চরিত্র অনেক থাকলেও এবং তাদের অনেক রকম স্বর থাকলেও তা কোনো না কোনো ভাবে লেখকের একক স্বরের ও একক চেতনার বিভিন্ন মাউথপিসরূপ অর্থাৎ মুখপাত্ররূপ প্রকাশ হতে পারে। সেরকম ক্ষেত্রে বহু চরিত্র ও বহুস্বরের মধ্যেও যার প্রকাশ ঘটবে তা মূলত একক স্বর ও একক চেতনা। বহুর মধ্য দিয়ে লেখকের একক স্বর ও একক চেতনার এমন প্রকাশকে বাখতিন বলেছেন **মনোলজিজম (monologism)**। সত্যিকারের পলিফোনি অর্জিত হলে সাহিত্যকর্মটিতে মনোলজিজমের স্থান থাকবে না। দস্তয়ভস্কির আলোচনায় বাখতিন দেখিয়েছেন দস্তয়ভস্কি কঠিনভাবে এই মনোলজিজম থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। বাখতিন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'দস্তয়ভস্কির চরিত্রগুলো লেখকের ডিসকোর্সের বিষয় (object) হওয়া সত্বেও তারা একই সাথে তাদের নিজেদের ডিসকোর্সের বিষয়ীও (subject)'। এই চরিত্ররা লেখক থেকে স্বাধীন। দুনিয়া সম্পর্কে তাদের স্বাধীন বোধ ও স্বাধীন ব্যাখ্যা রয়েছে এবং দুনিয়ার সাথে তাদের একান্ত নিজস্ব সম্পর্ক রয়েছে। এমন বহুস্বরের সহাবস্থান যখন লেখায় সন্নিবিষ্ট হতে পারে তখন সত্যিকার পলিফোনি অর্জিত হয় এবং সত্যিকার পলিফোনি অর্জিত হওয়ার গুণকে বাখতিন নাম দিয়েছেন **ডায়ালজিজম (dialogism)**। সুতরাং বাখতিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যাহাই পলিফোনিক তাহাই ডায়ালজিক। ডায়ালজিক হওয়া মানে এই নয় যে, সাহিত্যকর্মটিতে বহু চরিত্রের মাঝে ডায়লগ থাকবে। বহু চরিত্রের মাঝে ডায়লগ অধিকাংশ মনোলজিক সাহিত্যকর্মেই থাকে। বরং ডায়লজিক হওয়া মানে হলো সাহিত্যকর্মটিতে লেখকের চেতনা ও স্বর থেকে স্বাধীন বহুস্বরের সহাবস্থান থাকা ও তাদের ডায়লগের মধ্য দিয়ে প্লটের অগ্রসর হওয়া।

বাখতিন তাঁর ডায়ালজিজম বিষয়ক কথাবার্তা দস্তয়ভস্কির বড়ত্ব বোঝানোর অভিপ্রায়ে শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি এ নিয়ে তাঁর 'ডিসকোর্স ইন দ্য নভেল' প্রবন্ধে আরো কিছু কথাবার্তা বলেছেন যা অনেকটা দস্তয়ভস্কি সম্পর্কে বলা ডায়ালজিজম সংক্রান্ত ধারণা থেকে আলাদা, এবং শুধু আলাদাই নয়, কিছুটা পরস্পরবিরোধীও। শেষোক্ত প্রবন্ধে বাখতিন বলেছেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সব কথাবার্তা, মেলামেশা আর আচারআচরণই ডায়ালজিক। যুক্তি হিসেবে তিনি বলছেন যে, মানুষের কোনা কথাবার্তাই একক ও স্বাধীন নয়। মানুষের সকল কথাবার্তা আর সকল আচারআচরণ অর্থ দেয় ইতোপূর্বে সেসকল কথাবার্তা হাজার হাজার বার ব্যবহার হয়ে যে

অর্থভিত তৈরি করেছে সেই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। একইভাবে মানুষের আচারআচরণও সমাজে অর্থ সৃষ্টি করে ঐ আচারআচরণের হাজার হাজার পূর্বতন দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অর্থকাঠামোর অনুশাসন মেনে চলে। ফলে যে কোনো কথাই উচ্চারিত হবার সাথে সাথে তা পূর্বতন হাজার হাজার উক্তরূপ কথার সাথে অদৃশ্য ডায়লগ তৈরি করে এবং সেই ডায়লগের ভিত্তিতে ও সেই ডায়লগের পরোক্ষ অনুশাসনে বর্তমান উদ্দিষ্ট অর্থটি নিষ্পাদন করে। ফলে দুনিয়ার সকল ডিসকোর্সই ডায়লজিক। ডায়ালজিজম সম্পর্কে বাখতিনের এই ব্যাখ্যা উপন্যাসের পলিফোনি অর্জনের বিষয়ের সংশ্লেষে আমলে নেয়ার নয়। পলিফোনি অর্জিত হওয়া আর না-হওয়ার ভিত্তিতে যে মনোলজিজম ও ডায়ালজিজম তা অবশ্যই উপরে বর্ণিত 'প্রবলেমস অব দস্তয়ভস্কি'স পোয়েটিকস' প্রবন্ধে বিবৃত ধারণা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। 'ডিসকোর্স ইন দ্য নভেল' প্রবন্ধে ডায়লজিজম সম্পর্কে যে উদারপন্থী ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তাকে পালিফোনির সাথে মিলিয়ে কোনোভাবেই দেখা যাবে না। 'ডিসকোর্স ইন দ্য নভেল' প্রবন্ধে বিধৃত ডায়ালজিজমের উদারপন্থী ব্যাখ্যাকে বরং ভাষার অন্তস্থ দুর্বলতার এক দার্শনিক প্রকাশরূপে দেখতে হবে।

বাখতিনিজমের অংশ হিসেবে আরো তিনটি বিশেষ ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার: ক) হিটারোগ্লোসিয়া (heteroglossia), খ) কার্নিভালেস্ক (carnivalesque) ও গ) ক্রোনোটোপ (chronotope)। বাখতিন তাঁর হিটারোগ্লোসিয়া নামক ধারণাটি স্পষ্ট করেছেন তাঁর দুটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধ দুটো হলো 'Discourse in the Novel' ও 'From the Prehistory of Novelistic Discourse'। হিটারোগ্লোসিয়া হচ্ছে পলিফোনিরই এক ব্যাপক রূপ। পলিফোনির ক্ষেত্র হলো একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্ম। আর হিটারোগ্লোসিয়া হলো একটি ভাষার সার্বিক ব্যবহার জুড়ে বিস্তৃত পলিফোনি বা স্বরের বহুত্ব। এর সাথে সম্পর্কিত আরো একটি শব্দ হলো পলিগ্লোসিয়া (polyglossia)। শব্দটি পলিগ্লট থেকে এসেছে। পলিগ্লট হলো এমন ব্যক্তি যে বিভিন্ন ভাষা লিখতে, বলতে ও পড়তে জানে। তার মানে পলিগ্লোসিয়া হলো বহুভাষাভাষিকতা। বাখতিনের মতানুসারে পলিগ্লোসিয়া কোনো জাতিগত বা জাতীয় ভাষার স্বাধীন সত্তার বিষয়টিকে নাকচ করে এবং আরো বলে যে, কোনো জাতিগত একক ভাষায় কোনো সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। পৃথিবীর সকল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন একক কোনো ভাষা হয় না এবং তেমনি পৃথিবীর সকল ভাষার সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন একক কোনো সাহিত্যও হয় না। সাহিত্য মানেই ভাষার বহুত্ব। সে বহুত্ব অর্জিত হবে এক ভাষার সাথে আরেক ভাষার ডায়লজিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। মনে রাখতে হবে পলিগ্লোসিয়ার সাথে সম্পর্কিত ডায়লজিজমের এই ধারণা উপন্যাসে স্বরের বহুত্ব অর্জন বিষয়ক ডায়লজিজমের ধারণা থেকে ভিন্ন। একটি পলিগ্লোসিয়া বিষয়ক ডায়লজিজম, অপরটি পলিফোনি বিষয়ক ডায়লজিজম। ভাষার মধ্যকার ডায়লজিক এই সম্পর্কের কারণেই কোনো ব্যক্তি যে কোনো ভাষাতে কথা বলার ক্ষেত্রেই ঐ ভাষার মাঝে অঙ্গিভূত অন্যান্য ভাষার চেতনা ও স্বরকে বর্জন করে কথা বলতে পারেন না। বাখতিনের এই পলিফোনি ও ডায়লজিজম সংক্রান্ত ধারণার মূল আক্রমণটি ছিল তৎকালে সার্বজনীনভাবে প্রচলিত সাহিত্য ও ভাষার অনন্যতা ও সমসাত্ত্বিকতা বিষয়ক ধারণার ওপর। তিনি কঠিনভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন এই ধারণা যে, সুসাহিত্যে লেখকের স্বরের ও চেতনার কোনো অনন্যতার স্থান নেই এবং একইভাবে ভাষায় জাতীয়তার স্বরের ও চেতনার কোনো অনন্যতার স্থান নেই।

হিটারোগ্লোসিয়া দেখায় কীভাবে একটি ভাষা তার অভ্যন্তর থেকে ডায়লজিক হয়ে ওঠে (heteroglossia signifies how a language is dialogized internally)। বাখতিন তাঁর 'ডিসকোর্স ইন দি নভেল' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কীভাবে একই ভাষা বহুস্বরা ও বহুরূপী হয় তার ব্যবহারিক ক্ষেত্রভেদে। বন্ধুবান্ধবের সাথে কথা বলায় ভাষার স্বর এক রকম। দপ্তর সংস্থায় কথা বলার ভাষার স্বর অন্যরকম। আবার শিল্পকলা বা বিজ্ঞানের ভাষার স্বর আরেক রকম। এমন বহু স্বর একই ভাষায় সমান্তরালে বিদ্যমান। এটিই ভাষার অন্তর্গত হিটারোগ্লোসিয়ার কাজ। পলিগ্লোসিয়া ভাষাকে অপরাপর ভাষার সাথে ডায়লজিক সম্পর্কে অন্বিত করে তোলে আর হিটরোগ্লোসিয়া একই ভাষার মাঝে বহুস্বরের ডায়লজিজম সম্ভব করে তোলে। অন্যভাবে বলা যায়, পলিগ্লোসিয়া ভাষার বহিরাঙ্গিক (from without) ডায়লজিজম নিশ্চিত করে আর হিটারোগ্লোসিয়া ভাষার অন্তরাঙ্গিক (from within) ডায়লজিজম সম্ভব করে তোলে।

বাখতিনিজম বলতে যে-সকল ধারণাকে বোঝায় তাদের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো **কার্নিভালেস্ক** (carnivalesque)। কার্নিভাল হলো জাঁকালো কোনো উৎসব। বাখতিন বলেছেন বছরের বিভিন্ন পর্বে উৎসবের এমন জমক মধ্যযুগীয় ইউরোপিয় জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এ জাতীয় উৎসবে শরীরের এমন সব অঙ্গভঙ্গি চর্চিত ও কাঙ্ক্ষিত ছিল যা নিত্যদিনের সমাজমূল্যবোধের সাথে যায় না। ফলে এসব উৎসবে খুব জমকের সাথে ও স্বাধীনতার সাথে ভেঙে ফেলা হতো সমাজের সেই সকল নিয়মকানুন ও আদবকায়দা যা ভাঙা দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতায় কল্পনারও অতীত। রাজাবাদশাহ, সাধুসন্তদের নিয়ে পর্যন্ত এমন উৎসবে হাসিতামাশার সঙ সাজানো হতো। বাখতিন বলতে চান যে, এই উৎসবগুলো ছিল আদতে সামাজিক আদবকানুনের নিষ্পেষণমুখী নিগড় বা শৃঙ্খল ভাঙার এক পরোক্ষ প্রয়াস। পরোক্ষে এসকল উৎসব ছিল প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনের প্রতি এক ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং প্রাতিষ্ঠানিক অধিকারের প্রতি বিদ্রূপস্বরূপ। বাখতিন তাঁর Rabelais and His World গ্রন্থে লিখেছেন Carnival celebrated temporary liberation from the prevailing truth and from the established order; it marked the suspension of all hierarchical rank, privileges, norms and prohibitions. এর মধ্য দিয়ে ক্ষণকালের জন্য হলেও প্রাতিষ্ঠানিক তথা সমাজ-অনুশাসনের সত্য ও বিধিনিষেধের বিপরীতে দাঁড় করানো হতো সামাজিক বাস্তবতার ও সমাজের আকাঙ্ক্ষার সম্ভব অন্য বিবিধ রূপ। বাখতিন দেখিয়েছেন যে, রেনেসাঁসের আগমনের পর ধীরে ধীরে সমাজ থেকে এই কার্নিভাল চর্চা প্রশাসনিক কর্তৃত্বে বন্ধ করে দেয়া হয়। বাখতিনের মতে সামাজিকভাবে কার্নিভাল চর্চার পথ এভাবে রুদ্ধ করে দেয়ার পর কার্নিভালের

এই স্পিরিট তার আত্মপ্রকাশের পথ করে নেয় সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। প্যারোডি, স্যাটায়ার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে এবং উপন্যাস ও কবিতার অন্যান্য ফর্মে পরোক্ষভাবে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনেষেধকে সাহিত্য রেনেসাঁসের পর থেকে সেভাবে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করেছে যেমনটা মধ্যযুগে চ্যালেঞ্জ করেছিল রাস্তায় ও পাবলিক চত্বরে চর্চিত জনতার কার্নিভাল। সাহিত্যকে এভাবে জনতার কার্নিভাল হিসেবে দেখাতে বাখতিন বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ষোড়শ শতকীয় ফরাসি লেখক ফ্রাসোয়া র‍্যাবলের (Fracois Rabelais) নাম। ফ্রাসোয়া র‍্যাবলের 'দি লাইফ অব গারগান্তুয়া ও পান্তাগ্রুয়েল' এই কার্নিভালের উদাহরণ হলেও বাখতিন এই গ্রন্থের আলোচনায়ই বলতে চেয়েছেন যে, উপন্যাস হলো সাহিত্যের এমনই একটি ধারা যেখানে মহাকাব্যের ধারায় সমাজের কাঠামোবদ্ধ সত্য ও অনুশাসনিক রূপের প্রকাশও সম্ভব, আবার স্যাটায়ার বা প্যারোডির ধারায় এই সত্য ও অনুশাসনকে চ্যালেঞ্জ করার কার্নিভালেস্ক প্রকাশও সম্ভব। এই দ্বৈত প্রকাশের সম্ভাব্যতাও উপন্যাসের ডায়লজিক যোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে।

বাখতিনিজম সম্পর্কে আমাদের শেষ আলোচনার বিষয় হলো ক্রোনোটোপ (chronotope)। ক্রোনোটোপ শব্দটির 'ক্রোনো' (chrono) অর্থ হলো সময়, এবং 'টোপ' (tope) অর্থ হলো স্থান। দুয়ের মিলিত অর্থে বাখতিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ক্রোনোটোপ মানে হলো সাহিত্যের কোনো ফর্মে সময় ও স্থানের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক সাহিত্যের এক এক ফর্মে এক এক রকম। রোমান্সে এই সম্পর্ক বা ক্রোনোটোপ বেশ মজার ধরণের। রোমান্সের ক্রোনোটোপে সময়ও শূন্য এবং স্থানও শূন্য। সময় শূন্য কারণ আমরা দেখি রোমান্সে হিরো, ভিলেইন বা অন্যান্য চরিত্ররা যার যে ধরনের ভূমিকা সেই ধরনের ভূমিকাই রোমান্সের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পালন করে যায়। সময়ের পরিবর্তন অনুযায়ী চরিত্রদের নিজ নিজ চিন্তা ও কর্ম বদলায় না। অর্থাৎ পুরো রোমান্সের আগাগোড়া জুড়ে সময়টা স্থির থাকে। সময়ের এই অনড় অবস্থা মাতিয়ো বোয়ার্দোর 'অরলান্ডো ইনামোরাতো', কিংবা স্পেন্সারের 'ফেয়ারি কুইন', কিংবা ম্যালোরির 'লে মোর্তে দ'আর্থার' ইত্যাকার যে কোনো রোমান্সে দেখা যেতে পারে। এটাকেই বলা যায় রোমান্সের সময়-শূন্যতা বা সময়হীনতা। একইভাবে রোমান্সে স্থানও ঘটনায় বা কাহিনিতে কোনো পরিবর্তন আনে না। অরলান্ডোর রোমান্সের ফরেস্ট অব আর্ডেন ইংল্যান্ডের ওয়ারউইকশায়ারে হলেও যা ঘটবে, ইতালিতে হলেও তাই ঘটবে। ফলে অরলান্ডোর কাহিনির মতো রোমান্সের জন্য সব স্থান এক হয়ে যাওয়া মানে হলো রোমান্সের কাহিনির সংঘটন স্থান শূন্য হয়ে যাওয়া। রোমান্সের জন্য ক্রোনোটোপ এমন হলেও উপন্যাসের জন্য এমন নয়। বিভিন্ন উপন্যাসে ক্রোনোটোপের ধরণ এক এক রকম। বলা যায় ক্রোনোটোপের ধরনের ওপর উপন্যাসের ধরণ নির্ভর করে।

বিশেষ করে উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে, আমরা দেখলাম, বাখতিন অনেক ধারণার প্রবর্তক। তন্মধ্যে মনোলজিজম, ডায়লজিজম, পলিফোনি, পলিগ্লোসিয়া, হিটারোগ্লোসিয়া, কার্নিভালেস্ক, ক্রোনোটোপ ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারণা আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এযাবৎ আমরা সাহিত্যতত্ত্বের যে ধারণাগুলো আলোচনা করেছি সেগুলোর মাঝে মোটামুটিভাবে সময়ানুক্রমিক পরম্পরা রয়েছে। এরপর থেকে বিংশ শতকে যে ধারণাগুলো উদ্ভূত হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই যুগপৎ উদ্ভূত এবং সমান্তরাল সময়ে চলমান ধারণা। তাই আমাদের পরবর্তী আলোচনায় তত্ত্বসমূহের মধ্যে পারস্পরিক পরম্পরা আর রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

রিডার রেসপন্স থিয়রি: অবভাসবাদ বা ফেনোমেনোলজি

যেমনটা আগেই বলেছি, বিংশ শতকীয় সাহিত্যতাত্ত্বিক ধারণাসমূহ একে অপরের সাথে সময়ানুক্রম রক্ষা করে না। উদাহরণস্বরূপ, রিডার রেসপন্স থিয়রিকে আমরা কোন সময়ের থিয়রি ধরবো তা সঠিক করে বলতে পারি না। একদিকে এটি যেমন বিংশ শতকের শেষ দু'দশকের আগে উচ্চারিত হতে শুনি না, অপরদিকে তেমনি এটি উচ্চারিত হবার পরে দেখি এর তাত্ত্বিক জন্ম হয়েছিল বিংশ শতকের প্রথম দিকে, শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অবভাসবাদ নামক দার্শনিক তত্ত্বের সাথে।

সাহিত্যতাত্ত্বিক ধারণাগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করে নেয়া যায়: লেখক কেন্দ্রিক তত্ত্ব (author-centred theory), লেখা কেন্দ্রিক তত্ত্ব (text-centred theory), পাঠক কেন্দ্রিক তত্ত্ব (reader-centred theory) ও লেখার প্রসঙ্গ কেন্দ্রিক তত্ত্ব (context-centred theory)। লেখক কেন্দ্রিক তত্ত্বের (author-centred theory) উদাহরণ হিসেবে পুরনো যুগ থেকে বলা যায় রোমান্টিসিজম, আর বিংশ শতক থেকে বলা যায় সাইকো-এ্যানালাইটিকাল থিয়রি। লেখা বা টেক্সট কেন্দ্রিক তত্ত্বের উদাহরণ যেমন: নিউ ক্রিটিসিজম, রাশিয়ান ফরমালিজম, বাখতিনিয়ান ডায়লজিজম, স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম ইত্যাদি। অবভাসবাদ পাঠক কেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের একটি উদাহরণ। মার্কসিস্ট থিয়রি, ফেমিনিস্টিক থিয়রি, পোস্ট-কলোনিয়াল থিয়রি ইত্যাদি সবই লেখার প্রসঙ্গ কেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের উদাহরণ।

রিডার রেসপন্স থিয়রির জন্ম অবভাসবাদ থেকে; আর অবভাসবাদ বা ফেনোমেনোলজি নিয়ে আলোচনায় প্রথমেই যাঁর কথা বলতে হয় তিনি হলেন এডমান্ড হুসার্ল (১৮৫৯ - ১৯৩৮)। হুসার্ল পেশাগতভাবে গণিতশাস্ত্রবিদ হলেও তিনিই মূলত দর্শনের ফেনোমেনোলজি নামক ধারণার জনক বা প্রবর্তক। দর্শনের এই ধারা প্রবর্তিত হয়েছে তাঁর Pure Phenomenology: Its Method and Its Field of Investigation নামক বিখ্যাত প্রবন্ধের মাধ্যমে। এই প্রবন্ধের মাঝামাঝি হুসার্ল লিখেছেন No object of the category 'work of art' could occur in the objectivational world of any being who was devoid of all aesthetic sensibility, who was, so to speak, aesthetically blind. এই বাক্যের ব্যাখ্যায় আমরা বুঝতে পারবো

ফেনোমেনোলজি কীভাবে পাঠক কেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের বিষয়। সাধারণভাবে, অবজেক্ট হলো সেইসব বস্তু যারা চেতনারাজ্যের বাইরে অবস্থিত থাকে। কিন্তু ফেনোমেনোলজি বলে যে, বস্তু তখনই বস্তু হয় যখন তারা আমার চেতনারাজ্যে প্রবেশ করে। যখন আমি বস্তু হিসেবে একটি পেন্সিলের নাম করি তখন মুখ থেকে এমন কোনো বস্তু বের হয় না বা যে শোনে তার কাছে এমন কোনো বস্তু পৌঁছায় না যা হাতে ধরে নিয়েই লেখা শুরু করা যায়। বরং যা মুখ থেকে নিসৃত হয় বা যা শ্রোতার কানে পৌঁছায় তা হলো চেতনায় ধৃত একটি বস্তু যার অস্তিত্ব চেতনার ভিতরেই নির্ভর করে। চেতনায় ধারণের মাধ্যমে এভাবে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠা বস্তু হলো দর্শনের সংজ্ঞায় ফেনোমেনন। দর্শন অবশ্য বলে যে, মানুষের চেতনা বা অনুভবের ওপর নির্ভরশীলতা ছাড়াও স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠার মতো বস্তু প্রতিটি বস্তুতেই আছে, দর্শনের ভাষায় যার নাম হলো নুমেনন। তবে যেহেতু নুমেনন জাতীয় বস্তু তার অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠার জন্য মানুষের চেতনা বা অনুভবের ওপরে নির্ভর করে না তাই নুমেনন জাতীয় বস্তু আদতে কী বস্তু তা মানুষের পক্ষে জানাও সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষে বস্তুজগতের যেটুকু জানা সম্ভব সেটুকু হলো ফেনোমেনন। পেন্সিল নামের বস্তুটির যেটুকু মানুষের অনুভবে ও চেতনার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে মানুষের পক্ষে পেন্সিলের সেটুকুই জানা সম্ভব, আর সেটুকুই হলো পেন্সিলের ফেনোমেনন। পেন্সিলের মধ্যে বস্তুসত্যের আরো যদি কিছু থেকে থাকে তার নাম নুমেনন যা মানুষ কখনো জানতে পারে না। ফেনোমেনোলজি বস্তুর এই নুমেনন রূপকে অস্বীকার করে কারণ এটি মানুষের জ্ঞানের বাইরে। ফেনোমেনোলজি তাই বস্তুর ফেনোমেননকেই স্বীকার করে, নুমেননের বিষয়ে বলে- 'সে নিয়ে আমরা না ভাবি'। নুমেনন সম্পর্কে ভাবনা বন্ধের এই আদেশকে বলা হয় 'ফেনোমেনোলজিকাল ইপোকে' (phenomenological epoche)।

এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। উপরের উদ্ধৃত বাক্যে অবজেক্টিভেশনাল ওয়ার্ল্ড বলতে যে বস্তুজগৎকে বোঝানো হয়েছে তা ফেনোমেনোলজিকাল বস্তুজগৎ। এই জগতে বস্তু যেভাবেই অনুভবে বা চেতনায় উপস্থিত হবে সেভাবেই তাকে বস্তু হিসেবে মেনে নেয়া হবে। এমনকি ম্যাকবেথ নাটকে হ্যালুসিনেশন বা চেতনার ভ্রমে যে তলোয়ার ম্যাকবেথ দেখেছেন তাও ফেনোমেনোলজিকাল বস্তুজগতের অংশ। এটা বস্তুর অস্তিত্ব যা বস্তুর প্রতি ধাবিত অনুভবকারীর আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাশক্তির (intentionality) ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। ফেনোমেনোলজিতে এই ইচ্ছাশক্তির এতই শক্তি যে তা যে বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় সে বস্তু অন্যদশ জনের অনুভবে অস্তিত্বশীল না হলেও নির্দিষ্ট অনুভবকারীর নিকট তা অবজেক্টিভেশনাল ওয়ার্ল্ডের তথা ফেনোমেনোলজিকাল বস্তু জগতের অংশ, অর্থাৎ সে অস্তিত্বশীল বস্তু, যেমন ম্যাকবেথের দেখা তলোয়ার বা লেডি ম্যাকবেথের হাতের রক্ত। ফেনোমেনোলজির এই ধারণাটুকুই রিডার রেসপন্স থিয়রির দার্শনিক ভিত্তি।

এই ভিত্তির বলেই ফেনোমেনোলজিস্টরা বলে যে, বস্তুর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয় অনুভবের ইন্দ্রিয় দ্বারা। অন্য কথায় বস্তুর ছুরত ও ছিফত অনুভবকারীর ইন্দ্রিয়ের ও চেতনার দান। এই কথা যদি দার্শনিকভাবে মেনে নেয়া হয় তাহলে ফরমালিজম আর নিউক্রিটিসিজমের প্রবর্তকরা সাহিত্যকর্মের অর্থ ও বিষয়বস্তু উক্ত সাহিত্যকর্মের ভিতরে স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল ধরে যতসব তত্ত্বকথা বলেছেন তার আর দার্শনিক ভিত্তি থাকে না। কারণ ফেনোমেনোলজিস্টরা বলেন যে, সাহিত্যকর্মটি নিজেই স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল কিছু নয়। তাকে অস্তিত্বশীল হতে হয় অনুভবকারীর তথা পাঠকের চেতনা ও অনুভবের মধ্য দিয়ে। ফলে কোনো সাহিত্যকর্মের অর্থ ও বিষয়বস্তু সবই নির্ভর করবে পাঠকের অনুভবে ও চেতনায় তা কীভাবে অর্থবহ ও অস্তিত্বশীল হয়ে উঠবে তার ওপরে। উপরে উদ্ধৃত হুসার্লের বাক্যটির প্রসঙ্গ টেনে আবারো বলা যায়, যে-মানুষটির চেতনা ও ইন্দ্রিয়ে নন্দনবিষয়ক কোনো অনুভবশক্তি নেই তার কাছে বস্তু জগতে সুন্দর বা শৈল্পিক বলে কোনো বস্তু থাকতে পারে না। এই তত্ত্বের ওপর দাঁড়ানো রিডার রেসপন্স থিয়রির মোদ্দা কথা হলো কোনো শিল্প বা সাহিত্যকর্মের সৌন্দর্য ও অর্থ ঐ কর্মটির মাঝে স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল থাকে না, এর সকল সৌন্দর্য ও অর্থ অস্তিত্বশীল হয় পাঠকের পাঠের মধ্য দিয়ে তার চেতনা ও অনুভব রাজ্যের মাধ্যমে। একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, এই তত্ত্বমতে যে কোনো সাহিত্যকর্মের অর্থ ও সৌন্দর্য সাহিত্যকর্মটির পাঠকের চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভবের দান।

হুসার্লের ফেনোমেনোলজির এই বক্তব্য সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্বে প্রথম কাজে লাগান হুসার্লের ছাত্র **রোমান ইনগার্ডেন** (Roman Ingarden)। ফেনোমেনোলজিভিত্তিক তাঁর সাহিত্যতত্ত্বকে তিনটি পয়েন্টে উপস্থাপন করা যায়। এই তিনের প্রথমটিই হুসার্লের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাশক্তি (intentionality) বিষয়ক বক্তব্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হুসার্ল বলেছেন বাস্তবতা ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কিত, যে বিষয়ে আমরা উপরে আলোচনা করেছি। এই সূত্র ধরে ইনগার্ডেন বলছেন সাহিত্যের কোনো টেক্সট প্রথমত হলো লেখকের কোনো বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষর প্রকাশ ও সেই আকাঙ্ক্ষার রেকর্ড। দ্বিতীয় পয়েন্টে ইনগার্ডেন বলছেন যে, কোনো টেক্সটের পাঠ হলো প্রথমত লেখকের সেই আকাঙ্ক্ষাকে বা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস। এই পুনরুজ্জীবনকর্মে হুসার্ল বর্ণিত 'ইনটেনশলাটি' তত্ত্বের অংশ হিসেবে এবার পাঠকের আকাঙ্ক্ষাও ধাবিত হবে নির্দিষ্ট বস্তু বা অর্থের দিকে। কিন্তু সমস্যা হলো লেখকের আকাঙ্ক্ষার বস্তুর দিকেই যে পাঠকের আকাঙ্ক্ষা ধাবিত হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে লেখকের আকাঙ্ক্ষার বস্তুই যে পাঠকের পাঠের মধ্য দিয়ে পুনরুজ্জীবিত হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। লেখকের ইনটেনশনাল এ্যাক্ট লেখায় যেভাবে কোডিং হয় পাঠকের ইনটেনশনাল এ্যাক্ট দ্বারা লেখকের সেই ইনটেনশনাল এ্যাক্টই যে ডিকোডেড হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। ফলে লেখক পাঠকের যোগাযোগের মধ্যে ব্যাপক শূন্যতা তৈরি হয়। অবশ্য ইনগার্ডেন এর নাম দিয়েছেন টেক্সচুয়াল ইনডিটারমিনেসি বা অনিশ্চয়তা। ইনগার্ডেনের তৃতীয় পয়েন্ট হলো এই অনিশ্চয়তা দূরীকরণকে কেন্দ্র করে। টেক্সচুয়াল ইনডিটারমিনেসি দূরীকরণার্থে ইনগার্ডেনের মতে প্রয়োজন হয় পাঠকের নিজস্ব ব্যাখ্যার, যে ব্যাখ্যার নির্মাতা পাঠকের নিজের ইনটেনশনাল এ্যাক্ট। ইনগার্ডেন এর নাম দিয়েছেন **এ্যাক্টিভ রিডিং বা সক্রিয় পাঠ**। ইনগার্ডেনের মতে এই এ্যাকটিভ রিডিঙের মধ্য দিয়েই একটি সাহিত্যকর্ম পাঠকের কাছে মূর্ত বা

'কংক্রিটাইজড' হয়ে ওঠে। ফলে ইনগার্ডেনের মতে সাহিত্যকর্ম পাঠকের চেতনার ও অনুভবের বাহিরের রাজ্যে অবস্থিত কোনো স্বাধীন সত্তা নয়। এটি বাস্তব হয়ে ওঠে পাঠকের এ্যাক্টিভ রিডিঙের মাধ্যমে। এ্যাক্টিভ রিডিঙের মাধ্যমে লেখকের চেতনার সাথে পাঠকের চেতনার যোগাযোগ হয় এবং সে যোগাযোগে যে শূন্যস্থানগুলো থাকে তা পাঠকের ইনটেনশনাল এ্যাক্টের মাধ্যমে পূর্ণ হয়।

ইনগার্ডেনের এই ব্যাখ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে রিডার রেসপন্স থিয়রির আরেক প্রবক্তা **উলফগ্যাঙ ইজার (Wolfgang Iser)** এর বক্তব্য। ইনগার্ডেন যার নাম দিয়েছিলেন টেক্সচুয়াল ইনডিটারমিনেসি, ইজার তার নাম দিয়েছেন টেক্সচুয়াল গ্যাপ বা শূন্যতা। এই শূন্যতার কারণে টেক্সটের একটি অর্থপূর্ণ সুসমন্বিত পাঠ বাধাগ্রস্ত হয়, বুঝে ওঠার ধারাটি বাধাগ্রস্ত হয়। এই বাধাগ্রস্ততার তিনটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, টেক্সটের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। যেমন, একজন কবি তাঁর কবিতা কতগুলো পর্বে ও স্তবকে ভেঙে থাকেন। একজন ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসকে অনেক পরিচ্ছেদে ভেঙে থাকেন। এই জাতীয় ভাঙনগুলো অর্থের চলমানতারও এক ধরনের ভাঙন। এই ভাঙা জায়গাটি জোড়া লাগাতে পাঠককে যে চেষ্টা করতে হয় ইনগার্ডেন তার নাম দিয়েছেন এ্যাকিটভ রিডিং আর ইজার এর নাম দিয়েছেন ভাবায়ন বা **আইডিয়েশন (Ideation)**, যা নির্ভর করে পাঠকের কল্পনা ও বিশ্লেষণী শক্তির ওপর। দ্বিতীয় কারণটি হলো ন্যারেটিভ পারসপেক্টিভের বিচ্ছিন্নতা। আমরা জানি দস্তয়েভস্কির উপন্যাসগুলোতে বহুস্বরের পারসপেক্টিভ রয়েছে। লেখকের স্বরই সেখানে একমাত্র স্বর নয়। ফলে স্বর ও চেতনাগতভাবে এই উপন্যাসে বহু এককের বিচ্ছিন্ন রূপ রয়েছে। উপন্যাসটিকে একক সমগ্রতায় বোঝার জন্য এই বহুস্বরকে এবং বহু চেতনাকে জোড়া দেয়া বা এক সুতায় গাঁথার জন্য পাঠককে চেষ্টা করতে হয়। পাঠককে তার চেতনা রাজ্যে এক ধরনের কোলাজ সৃষ্টি সৃষ্টি করতে হয়। সে কোলাজ প্রত্যেক পাঠকের কাছে স্বাভাবিকভাবেই এক ও অভিন্ন নয়, বরং বহুরকম। ইজারের মতে পারসপেক্টিভের বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতাকে কোলাজের একক সমগ্রতায় আনয়নও সম্ভব হয় পাঠকের আইডিয়েশন ক্রিয়ার মাধ্যমে। টেক্সচুয়াল গ্যাপের তৃতীয় কারণটি 'পাঠক কে' তার ওপর নির্ভরশীল। লেখার ঈপ্সিত পাঠক আর লেখার সত্যিকারের পাঠক ভিন্ন হওয়ার কারণেও লেখার সাথে পাঠকের গ্যাপ তৈরি হয়। একটি ধর্মগ্রন্থের ঈপ্সিত পাঠক ঐ ধর্মের একজন ভক্ত মানুষ। কিন্তু যখন পাঠকটি হন ঐ ধর্মের সাথে অপরিচিত বা অবিশ্বাসী একজন, তখন স্বাভাবিকভাবেই লেখার সাথে পাঠকের অপরিহার্য গ্যাপ সৃষ্টি হয়। এই গ্যাপও পাঠককে পূরণ করে নিতে হয় তার আইডিয়েশন দ্বারা।

রিডার রেসপন্স থিয়রির মূল বিষয়টি হলো ইনগার্ডেন কথিত এ্যাকটিভ রিডিং বা ইজার কথিত আইডিয়েশন দ্বারা লেখার ইনডিটারমিনেসি বা অর্থের অনির্দিষ্টতাগুলো দূর করা বা পাঠকালে অনুভূত গ্যাপগুলো পূরণ করা। এমনকি যদি কোনো টেক্সটে লেখকের ইচ্ছাকৃত অর্থ-অনির্দিষ্টতা রেখেও দেয়া হয় পাঠক সেই অনির্দিষ্টতার মধ্যে পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারে না। তাকে আইডিয়েশনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্টতায় পৌঁছতে হয়। ইনগার্ডেন ও ইজারের এই বক্তব্য থেকে একটা সমস্যার সূত্রপাত হয়। সেটি হলো এই যে, টেক্সটের গ্যাপগুলো বা অর্থ-অনির্দিষ্টতাগুলো এক এক পাঠক যখন এক এক ভাবে পূরণ করবেন তখন ঐ টেক্সটটির সাধারণভাবে গ্রহণীয় কোনো অর্থই তো থাকবে না। ফলে মানুষ টেক্সটটি নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার জন্য যে কোনো একটা রেফারেন্স দিবে সেই রেফারেন্সই তো সম্ভব হবে না। এর উত্তরে ইজার বলতে চেয়েছেন যে, পাঠক সম্পূর্ণটা তো তার ইনটেনশনাল এ্যাক্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। পাঠক তো লেখকের ইনটেনশনাল এ্যাক্ট দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হবে। ফলে পাঠকে পাঠকে আইডিয়েশনের ভিন্নতা থাকলেও লেখকের ইনটেনশনাল এ্যাক্ট তাদেরকে মোটামুটি একটা সূত্রে গেঁথে রাখবে। ফলে পাঠক ইচ্ছে করলেই আইডিয়েশনের দ্বারা ভুলপাঠের (misreading) নৈরাজ্যে পৌঁছবে না।

মিসরিডিং-এর প্রসঙ্গটা যেহেতু উঠলো সেহেতু হ্যারল্ড ব্লুমের এ সংক্রান্ত ভাবনাটির সাথে একটু পরিচিত হওয়া যেতে পারে। হ্যারল্ড ব্লুমের মিসরিডিং কোনো নেতিবাচক ধারণা নয়, বরং একটি ইতিবাচক ধারণা। হ্যারল্ড ব্লুম বলেছেন যে, সব লেখক অতীতের লেখকদের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চান। কিন্তু অতীতকে অস্বীকার করে তো আর নতুনের নির্মাণ সম্ভব নয়। তাই লেখকরা যা করেন তা হলো অতীতের লেখাকে যতটা পারা যায় ভাঙতে চেষ্টা করেন, বিকৃত করে (distorting) তার ওপর নতুনের নির্মাণ দাঁড় করাতে চান। ব্লুম এই বিকৃতির নাম দিয়েছেন মিসরিডিং (misreading)। দেখা যাচ্ছে শব্দটা মিসরিডিং হলেও কাজটি রিডারের নয় বরং রাইটারের অর্থাৎ লেখকের। ব্লুমের মতে মিসরিডিং দুরকমের: দুর্বল ও সবল মিসরিডিং। দুর্বল মিসরিডিং মানে লেখকের মৌলিকত্ব কম, আর সবল মিসরিডিং মানে হলো লেখকের মৌলিকত্ব বেশি। ফলে ব্লুমের মতে মিসরিডিং লেখকদের একটা বড় গুণ যে-গুণের বলে লেখকরা অতীতের লেখকদের প্রভাববলয় থেকে নিজেদেরকে যোগ্যতার সাথে রক্ষা করে থাকেন। আগেই বলেছি, ব্লুমের এই মিসরিডিং লেখকের সাথে সংশ্লিষ্ট, পাঠকের সাথে নয়। ফলে এই মিসরিডিং রিডার রেসপন্স থিয়রির পাঠকদের আইডিয়েশন ও লেখকের ইনটেনশনাল এ্যাক্টের মধ্যকার সংযোগহীনতায় তৈরি মিসরিডিং নয়।

রিডার রেসপন্স থিয়রির আলোচনায় আরেকজনের কথা বলতেই হয়। তিনি হলেন স্ট্যানলি ফিশ (Stanley Fish)। স্ট্যানলি ফিশের দুটি ধারণা রিডার রেসপন্স থিয়রির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ: **এ্যাফেকিটভ স্টাইলিসটিকস** (affective stylistics) **ও ইন্টারপ্রিটিভ কমিউনিটিজ** (interpretive communities)। এ্যাফেক্টিভ স্টাইলিসটিকস মানে হলো কোনো টেক্সটের পাঠ পাঠককে কীভাবে প্রভাবিত করে (affect) এবং সেই প্রভাব কীভাবে পাঠের প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কিত ধারণা। রিডার রেসপন্স থিয়রির মূলসূত্রেই বলা হয়েছে যে, টেক্সট কোনো স্বাধীন সত্তা নয়। পাঠকের চেতনার মধ্য দিয়ে সে বাস্তব হয়ে ওঠে। পাঠক তার পাঠের মাঝে আরোপ করে তার নিজের কল্পনা, অনুভূতি ও প্রত্যাশা। পাঠ যত আগায় এই কল্পনা, অনুভূতি ও প্রত্যাশা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং ফলস্বরূপ টেক্সটটি সম্পর্কে পাঠকের ভাবনায় বা ধারণায়ও পরিবর্তন আসতে থাকে। তার মানে টেক্সটটির প্রতি পাঠকের রেসপন্স অনুযায়ী টেক্সটটি নির্মিত হতে থাকে। পাঠকের রেসপন্স অনুযায়ী টেক্সটের এই নির্মাণই ফিশের মতে এ্যাফেকটিভ স্টাইলিসটিকস।

এ্যাফেক্টিভ স্টাইলিসিটকস সেই সমস্যাটি আবার সামনে আনে যে, টেক্সট যদি পাঠকের রেসপন্স অনুযায়ী এভাবে নির্মিত হতে থাকে তাহলে একই টেক্সট তো এক এক জন পাঠকের কাছে এক এক ভাবে নির্মিত হবে আর তার ফলে টেক্সটের কোনো একক ও সর্বজনগ্রহণীয় রূপই থাকবে না। স্ট্যানলি ফিশ এই সমস্যার উত্তর দিয়েছেন তাঁর ইন্টারপ্রিটিভ কমিউনিটি বা বিশ্লেষক গোষ্ঠী সংক্রান্ত ধারণার দ্বারা। ইজার এই সমস্যার সমাধান দিয়েছিলেন লেখকের ইনটেনশনাল এ্যাক্ট দ্বারা। ফিশের ক্ষেত্রেও লেখকের ইনটেনশনাল এ্যাক্টই এর সমাধানের ভিত্তি। তবে তার সাথে তিনি আরো কিছু প্রসঙ্গ যুক্ত করেছেন। তিনি বলছেন লেখক ও পাঠক উভয়ই একই ইন্টারপ্রিটিভ কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত। তারা উভয়ই ধারণ করে একই সাহিত্যিক ধারার ঐতিহ্য ও একই একই সাংস্কৃতিক ভাবনারীতি। ফলে একই টেক্সটের ভিত্তিভূমে দাঁড়িয়ে তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই। তারা একই বিশ্লেষণী গোষ্ঠীভুক্ত বলে তাদের বিশ্লষণে ও অর্থে একটি যৌথ সংহতির জায়গা থাকবেই। এভাবেই রিডার রেসপন্স থিয়রি অর্থ উদ্ধারে বা টেক্সচুয়াল শূন্যতা পূরণে পাঠকের স্বেচ্ছাচারিতার আশঙ্কাকে নাকচ করেছে। তবে এ উত্তর বা সমাধান অনেকের কাছেই খুব গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাই রিডার রেসপন্স থিয়রি সাহিত্যতত্ত্বে খুব বড় জায়গা করেও নিতে পারেনি। বিংশ শতকের সাহিত্যতত্ত্বে যে ধারণাটি পূর্বের সকল তত্ত্বকে একটি জোর ঝাঁকুনি দিয়েছিল সেটি হলো স্ট্রাকচারালিজম বা কাঠামোবাদ। আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয় স্ট্রাকচারালিজম।

স্ট্রাকচারালিজম বা কাঠামোবাদ

সাহিত্যতত্ত্বে কাঠামোবাদের কোনো সোজাসাপ্টা সংজ্ঞা নেই। তবে এইটুকু বলা যায় যে, কাঠামোবাদের মূল কথা হলো কাঠামোর বাইরে কোনো বস্তুর কোনো অর্থ নেই। এর পরের কথা হলো কাঠামো কী। কাঠামো হলো সেই সব নির্মাণ যেখানে নির্মাণের উপাদানগুলো তাদের নিজ স্বাধীন অস্তিত্ব আর ধারণ করে না বরং কাঠামোর মধ্যে লীন হয়ে যায়। যেমন, বলা যেতে পারে একটি দালানের কথা। দালানে ইট আছে, বালু আছে, রড আছে, সিমেন্ট আছে। কিন্তু এইসব উপাদানের আর কারোই কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। সকলের স্বাধীন অস্তিত্ব দালানের মাঝে লীন হয়ে গেছে। তাই দালান একটি কাঠামো। ইটের স্তূপ বা বালুর রাশি কোনো কাঠামো নয়, কারণ ইটের স্তূপে বা বালুর রাশিতে ইট ও বালু সম্পূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্বে বর্তমান। একটি দরজা বা জানালাও এমনিভাবে দালান থেকে আলাদা স্বাধীন অস্তিত্বে কল্পনা করলে সে আর দরজা জানালা থাকবে না এবং কাঠামোর অংশ না হওয়ার কারণে কাঠামোর মধ্যে তার যে অর্থ তা আর কার্যকর থাকবে না। এভবেই কাঠামো তার অঙ্গ বা অংশকে তার অর্থের মাঝে লীন করে তোলে। এই বয়ান থেকে কাঠামোবাদ বিষয়ে অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়: ক) একটি কাঠামো অনেক উপাদান বা অঙ্গ দ্বারা তৈরি হয় এবং উপাদানগুলো কাঠামোর অধীন হয়; এবং খ) গঠনকারী উপাদানসমূহ ঐ কাঠামোর অধীন হিসেবেই শুধু নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে এবং কাঠামোটির বাহিরে নিয়ে গেলে ঐ উপাদানের ঐ নির্দিষ্ট অর্থ আর থাকে না।

ফার্দিনান্দ দে সস্যুর ও কাঠামোবাদ: এই কথাগুলো মাথায় রেখে আমরা ফার্দিনান্দ দে সস্যুরের ভাষা সম্পর্কিত ধারণাগুলো আলোচনা করবো সাহিত্যতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত কাঠামোবাদের ভিত্তিটা বোঝার জন্য। সস্যুর সুইজারল্যান্ডের একজন ভাষাবিজ্ঞানী। তাঁর 'কোর্স ইন জেনারেল লিঙ্গুইস্টিকস' নামক গ্রন্থের জন্য তিনি দুনিয়া জুড়ে বিখ্যাত। তবে গ্রন্থটি তিনি নিজে লিখে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্যরা তাঁর বক্তৃতাগুলো জড়ো করে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানে তিনিই প্রথম দুনিয়াকে বলেছেন যে, ভাষা হলো একটি কাঠামো। তাঁর আগে ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাবনা ছিল যে, স্বাধীনভাবে অর্থবহ অজস্র শব্দ একত্র হয়ে ভাষার সৃষ্টি হয়। এই শব্দসম্ভার কীভাবে ইতিহাসের পথ বেয়ে ধরে ধীরে ধীরে একত্র হলো এবং ভাষারূপে বিবর্তিত হলো তার পাঠই ছিল ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। ভাষাবিজ্ঞানের এই ধারণাকে ডায়াক্রনিক এ্যাপ্রোচ (Diachronic Approach) বলা হয়। সস্যুর এই ডায়াক্রনিক এ্যাপ্রোচের ইতি ঘটিয়ে সিনক্রনিক এ্যাপ্রোচের (Synchronic Approach) জন্ম দিলেন।

ভাষাবিজ্ঞানের এই সিনক্রনিক এ্যাপ্রোচে সস্যুর বললেন যে, শব্দ কোনো অকৃত্রিম অর্থ নিয়ে ভাষায় প্রযুক্ত হয় না, বরং ভাষার কাঠোমোতে স্থান পাওয়ার পরে অন্য শব্দের সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে তার অর্থ সৃষ্টি হয়। এই কথা বোঝানোর জন্য সস্যুর শব্দ নামক ধারণাটিকে নতুন পরিচয়ে অন্য নামে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন শব্দমাত্রই একধরনের সাইন (sign) বা চিহ্ন। কোনো চিহ্ন যখন কোনো বস্তুকে বোঝায় তখন চিহ্নটির সাথে বস্তুটির কোনো অন্তর্গত বা কার্যকারণগত সম্পর্ক থাকে না। তেমনই শব্দ যে বস্তুকে বোঝায় তার সাথে শব্দের কোনো অন্তর্গত বা কার্যকারণগত সম্পর্ক নেই বিধায় সকল শব্দকেই তিনি নাম দিয়েছেন সাইন। প্রতিটি সাইনের দুটি দিক রয়েছে- একটি ধ্বনিগত, আরেকটি বস্তুগত। শব্দ তথা সাইনটি যে ধ্বনিরূপে উচ্চারিত সেই ধ্বনিটিকে তিনি বলেছেন 'সিগনিফায়ার' (signifier), আর সেই ধ্বনি যে বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে তিনি বলেছেন 'সিগনিফাইড' (signified)। 'কলম' শব্দটির ধ্বনিরূপ হলো সিগনিফায়ার, আর এই ধ্বনি উচ্চারিত হলে লেখার যে হাতিয়ারটি বোঝায় সেটি হলো সিগনিফাইড। সস্যুর বলেছেন সিগনিফায়ার সিগনিফাইডকে নিজে নিজে বোঝাতে পারে না। সিগনিফায়ারগুলো ভাষার কাঠামোতে প্রবেশের পরে সিগনিফায়ারগুলোর মাঝে যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে সিগনিফায়ারগুলো তাদের সিগনিফাইডকে বোঝানোর যোগ্যতা অর্জন করে। 'বিশ' এবং 'বিষ' সিগনিফায়ার রূপে একই ধ্বনি, কিন্তু তাদের সিগনিফাইড যে ভিন্ন তা নির্ণীত হয় ভাষার ও বাক্যের অন্যান্য সিগনিফায়ারের সাথে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে। মনে রাখতে হবে যে, এই সম্পর্ক হলো ভিন্নতার এবং বৈপরীত্যের সম্পর্ক। উদাহরণস্বরূপ সিগনিফায়ার 'লাল' তার নিজ ধ্বনিরূপ থেকে কোনো রঙকে বোঝাতে পারে না। সে শুধু কমলা, হলুদ, সাদা, বেগুনি, সবুজ ইত্যাদির বিপরীতে দাড়িয়ে সেই রঙের অবস্থাকে বোঝাতে পারে যা ঐগুলো দ্বারা বোঝায় না। সুতরাং 'লাল'-এর অর্থ

অন্যদের বৈপরীত্যে দাঁড়ানোর যোগ্যতা থেকে উদ্ভূত, 'লাল'-এর নিজস্ব ধ্বনিরূপ থেকে উদ্ভূত নয়। একইভাবে প্রমাণিত যে, 'লাল' ধ্বনিরূপে কোনো অর্থ বহন করে না বরং ভাষার কাঠামোতে অবস্থান পাওয়ার ফলে অর্থ বহনের যোগ্যতা অর্জন করে। সিগনিফায়ারদের বৈপরীত্যের সম্পর্ক থেকে অর্থ উদ্ভবের বিষয়ে আরো স্পষ্ট উদাহরণ বৈপরীত্যের দ্বিপদগুলো (oppositional binaries), যেমন দিন-রাত, ছাত্র-শিক্ষক ইত্যাদি। এসব দ্বিপদের একটির অর্থ অন্যটির মাঝে তার অনুপস্থিতি দ্বারাই শুধু বোধগম্য হয়। ফলে পারস্পরিক বৈপরীত্যই এদের অর্থের নির্মাতা। সস্যুরের মতে ভাষা তার কাঠামোর মধ্যে সিগনিফায়ারদের পারস্পরিক সকল সম্পর্কের বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই সম্পর্ক ভাষার বাহির থেকে কেউ নিরূপণও করতে পারে না, নির্মাণও করতে পারে না।

সস্যুরের সাইন ও সিগনিফায়ারের এই ধারণাকে আরো সম্প্রসারিত করে বলা যায় যে, সাইন ও সিগনিফায়ারের মাধ্যমে ভাষাই আমাদের বাস্তবতাকে নির্মাণ করে। আমাদের ভাষা ছয় ঋতুতে বছরকে ভাগ করেছে বলে ওর মধ্য দিয়েই আমরা বছরকে চিনি, যদিও একটি নির্দিষ্ট ঋতুর শেষ দিনের পরের দিনে এমন কিছু দেখি না যা দ্বারা নতুন ঋতুটিকে চিহ্নিত করা যায়। ফলত ঋতুর বাস্তবতা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত নয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দ্বারাও নির্মিত নয়, বরং ভাষা দ্বারা নির্মিত। আবার রঙের বাস্তবতা হাজার রূপ হলেও মাত্র সাতটি সিগনিফায়ার তথা সাতটি নাম দ্বারা রঙের সামগ্রিক বাস্তবতা নির্মিত। এভাবে বাস্তবতা সম্পর্কিত সকল রূপ সিগনিফায়ারের মধ্যে আটকে থাকার কারণে মানুষ তার অনুভবের কোনো বাস্তবতা সিগনিফায়ারের তথা ভাষার বাইরে গিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। ফলে প্রমাণিত হয় যে, সকল বাস্তবতাই ভাষার নির্মাণ।

এবার আরেকটি প্রশ্ন আসে। ভাষা যদি তার সম্পর্কগত নিজস্ব নিয়মের মধ্যে সবসময় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তাহলে হাজারো ব্যক্তির ব্যবহারে হাজারো স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষার উদ্ভব হওয়ার কথা। কিন্তু তা কেন হয় না? এর উত্তর রয়েছে ভাষার কাঠামো সম্পর্কে সস্যুরের প্রদত্ত অপর দুটি ধারণায়। ধারণা দুটোর একটির নাম 'লাঙ' (langue) এবং অপরটির নাম 'পারোল' (parole)। এই দুটো ধারণা বোঝাতে সস্যুর উদাহরণ টেনেছেন দাবা খেলা থেকে। দাবা খেলায় প্রত্যেকটি ঘুটির চালের একটা নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম অনুসরণ করে একজন মানুষ যখন দাবা খেলে তখন প্রতিটি খেলা তার চাল পরম্পরায় আরেকটি খেলা থেকে আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি খেলা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিটি খেলা এভাবে আলাদা হলেও প্রতিটি খেলাই সম্পন্ন হয় দাবা খেলার সাধারণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নিয়মের অধীন থেকে। ভাষার ব্যবহারও এমন। প্রত্যেক মানুষের ভাষা তার একক সমগ্রতার বিন্যাসে আরেকজন মানুষের ভাষা থেকে আলাদা কাঠামোতে স্বাধীন যেমন স্বাধীন ও আলাদা প্রতিটি মানুষের নিজের দাবা খেলাটি। একই সাথে প্রতি মানুষের এই নিজ ভাষাটি সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের সমগ্র মানুষের ভাষার সাধারণ কাঠামোর অধীন। সস্যুরের বর্ণনায় ব্যক্তির ভাষাটির কাঠামো হলো পারোল (parole), আর সকল ব্যক্তির ভাষা সংশ্লিষ্ট ভাষাটির বৃহত্তর কাঠামোর যে সাধারণ নিয়মের অধীন সেই কাঠামো হলো লাঙ (langue)। প্রত্যেক পারোলের কাঠামো বৃহত্তর কাঠামো লাঙের অধীন বলেই একজনের ভাষার ব্যবহার আরেকজনের কাছে বোধগম্য ভাষা হয়ে ওঠে।

ক্লদ লেভি-স্ট্রস ও কাঠামোবাদ: সস্যুর কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট করে ভাষা সম্পর্কে যা বললেন তাকে সাহিত্য বিশ্লেষণে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে সস্যুর কিছু বলে যাননি। সস্যুর বর্ণিত ভাষা-কাঠামোর ধারণাকে ভাষার বাইরে এনে মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন বিশ্লেষণের জন্য প্রথম ব্যবহার করলেন নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভি স্ট্রস (১৯০৮-২০০৯) এবং তিনিই সস্যুরের কাঠামো চিন্তাকে সাহিত্যের রাজ্যে ব্যবহারের পথ করে দিয়েছিলেন। এর জন্য তিনি সস্যুর বর্ণিত লাঙ ও পারোলের ধারণা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন বিখ্যাত ইদিপাস মিথ। এই বিশ্লেষণের প্রবন্ধটির নাম 'দি স্ট্রাকচারাল স্টাডি অব মিথ'। তিনি মিথের এই বিশ্লেষণে ভাষার কাঠামোকে এমনভাবে অনুসরণ করেছেন যে, ভাষা যে-ধ্বনি একক দিয়ে তৈরি হয় তার নাম 'মরফিম' (morpheme) বলে তিনি মিথ যে-ঘটনা একক দিয়ে তৈরি হয় মরফিমের সাথে মিল রেখে তার নাম দিলেন 'মিথিম' (mytheme)। মিথিমের একক এবং লাঙ ও পারোলের ধারণা দিয়ে তিনি কীভাবে মিথ বিশ্লেষণ করলেন তা বোঝার জন্য আমরা এখানে ইদিপাস সংক্রান্ত মিথটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

ইদিপাস সংক্রান্ত মিথটির শুরু ক্যাডমসের কাহিনি থেকে। ক্যাডমসের বোন ইউরোপাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল জিউস। ইউরোপার অপহরণের পরে ইউরোপার বাবা তার ছেলেদেরকে আদেশ করলেন বোনকে খুঁজে আনতে। ইউরোপার ভাই ক্যাডমস ও অন্যান্য ভাইয়েরা বোনের সন্ধানে নামলো কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলো না। খুঁজতে খুঁজতে ক্যাডমস হাজির হয়েছিলেন ডেলফি নামক স্থানে। ডেলফির বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা তাঁকে বললেন যে, ইউরোপাকে খুঁজে কোনো লাভ নেই, কারণ তাকে কোথাও পাওয়া যাবে না। তবে ভবিষ্যদ্বক্তা ক্যাডমসকে বললেন তিনি যেখানে খুঁজতে এসেছেন সেখানে তিনি একটি নতুন শহর পত্তন করতে পারেন। ভবিষদ্বক্তার এই বাণীতে প্রীত হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে পাঠালেন একটু বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করতে যে পানি তিনি এ্যাথিনা দেবীর উদ্দেশ্যে একটি গরু উৎসর্গের কাজে ব্যবহার করবেন। সঙ্গীরা পানি আনতে গিয়ে কেউ আর ফিরে আসছে না দেখে ক্যাডমস নিজেই গেলেন তাদের খোঁজে। গিয়ে দেখেন এক ড্রাগন তাদের সকলকে হত্যা করেছে। তিনি তখন ড্রাগনকে পরাস্ত করে হত্যা করেন এবং ড্রাগনের দাঁতগুলো মাটিতে রোপন করেন। ড্রাগনের দাঁত থেকে স্পার্টোইদের জন্ম হয় এবং স্পার্টোইরা একে অপরকে হত্যায় নেমে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ৫ জন বেঁচে থাকে। এই ৫জন পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করে এবং তারা ক্যাডমসের বশ্যতা স্বীকার করে। এরপরে তদের নিয়ে ক্যাডমস যে শহর পত্তন করেন তারই নাম থিবিস।

থিবিসের প্রতিষ্ঠাতা এই ক্যাডমসের নাতি ছিলেন ল্যাবডাকোস। ল্যাবডাকোস অর্থ হলো খোঁড়া। ল্যাবডাকোসের পুত্র ছিলেন লেয়াস। লেয়াস অর্থ হলো বামহাতি। ডেলফির ভবিষ্যদ্বক্তা লেয়াসকে সতর্ক করলেন যে তার পুত্র তাকে হত্যা করবে এবং তার স্ত্রীকে বিবাহ করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে শঙ্কিত হয়ে লেয়াস তাঁর নবজাত পুত্রের দুই পা পেরেকবিদ্ধ করে এক ভৃত্যের হাতে দিলেন শিশুটিকে দূরে পাহাড়ে ফেলে আসতে যাতে শিশুটি সেখানে মারা যায়। কিন্তু শিশুটি মারা গেল না বরং এক রাখাল শিশুটিকে নিজ গৃহে নিয়ে লালন করলো। পেরেকবিদ্ধ শিশুর পা ফুলে গিয়েছিল বলে এই শিশুর নাম হলো ইদিপাস অর্থাৎ পা-ফোলা। বড় হয়ে ইদিপাস ডেলফির ভবিষ্যদ্বক্তার কাছ থেকে দৈববাণী শুনলেন যে, তাঁর হাতে তাঁর পিতা মারা যাবে এবং তিনি বিয়ে করবেন তাঁর মাকে। তিনি তো ভাবছেন তাঁকে যারা লালন-পালন করছেন তারাই তাঁর মা-বাবা। তাই যাতে বাবাকে হত্যা করতে না হয় এবং মাকে বিয়ে করার মতো ঘৃণ্য কাজে জড়াতে না হয় সে লক্ষ্যে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে থিবিস চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির রথের সাথে ধাক্কা লাগায় তাঁর সাথে ইডিপাসের ঝগড়া হলো এবং এক পর্যায়ে ইডিপাস তাকে হত্যা করলেন। এই ব্যক্তিই ছিলেন রাজা লেয়াস অর্থাৎ ইডিপাসের পিতা। এভাবে পিতাকে হত্যা করে ইডিপাস যখন থিবিস উপস্থিত হলেন তখন দেখলেন সেখানে একটি স্ফিংস মানুষকে বিভিন্নরকম ধাঁধা জিজ্ঞেস করছে এবং ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে না পারায় স্ফিংস মানুষগুলোকে হত্যা করছে। ইডিপাস স্ফিংসের ধাঁধার সঠিক জবাব দিয়ে থিবিসের মানুষদেরকে রক্ষা করায় থিবিসবাসী কৃতজ্ঞতার সাথে ইডিপাসকে তাদের রাজা হিসেবে বরণ করে। রাজা হয়ে স্বাভাবিকভাবে তিনি রাণী জোকাস্টাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে যখন প্রকাশিত হলো এবং ইডিপাস জানতে পারলেন যে তিনি নিজ হাতে পিতাকে হত্যা করেছেন এবং মাকে বিয়ে করেছেন তখন অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় তিনি আপন চক্ষুদ্বয় বিদীর্ণ করে অন্ধত্ব বরণ করলেন এবং রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। এক পর্যায়ে রাজার উত্তরসূরী ইটিওক্লেস ও পলিনাইসিসের মধ্যে বিবাদ শুরু হলো এবং ইটিওক্লেস পলিনাইসিসকে হত্যা করলো। হত্যার পরে ইটিওক্লেস ঘোষণা করলো যে, কেউ পলিনাইসিসের মৃতদেহ সৎকার করতে পারবে না, যদি কেউ পলিনাইসিসের মৃতদেহ সৎকার করে তাহলে সৎকারকারীকে জীবন্ত কবর দেয়া হবে। ইটিওক্লেসের এই ঘোষণা উপেক্ষা করে তাদের বোন আন্তিগোনি পলিনাইসিসের মৃতদেহ সৎকার করলেন এবং পরিণতি এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করলেন।

এই মিথের বিশ্লেষণে লেভি-স্ট্রস প্রথমে পুরো মিথটিকে মিথিমে বিশ্লেষিত করলেন। আমরা আগেই বলেছি লেভি-স্ট্রসের মতে মিথিম হলো মিথের ঘটনা-একক। পুরো মিথটিকে বিশ্লেষণ করে লেভি-স্ট্রস যে ঘটনা-একক বা মিথিমগুলো পেলেন সেগুলো হলো: ক) ক্যাডমস কর্তৃক তাঁর অপহৃত বোন ইউরোপাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়া, খ) ক্যাডমস কর্তৃক ড্রাগন হত্যা, গ) স্পার্টোইদের একে অপরকে হত্যা করা, ঘ) খোঁড়া রূপে ক্যাডমসের নাতি ল্যাবডাকসের জন্ম (ল্যাবডাকস অর্থ খোঁড়া), চ) খোঁড়া ল্যাবডাকসের পুত্র রূপে বামহাতি লেয়াসের জন্ম (লেয়াস মানে বামহাতি), ছ) লেয়াসের পুত্ররূপে পা-ফোলা ইডিপাসের জন্ম (ইডিপাস মানে পা-ফোলা), জ) ইডিপাসের হাতে তাঁর পিতা লেয়াসের খুনের ঘটনা, ঝ) ইডিপাস কর্তৃক স্ফিংস হত্যা, ঞ) ইডিপাস কর্তৃক মাকে বিবাহ, ট) ইটিওক্লেস কর্তৃক ভাই পলিনাইসিসকে হত্যা, ও ঠ) ইটিওক্লেসের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আন্তিগোনি কর্তৃক ভাই পলিনাইসিসের মৃতদেহ সৎকার।

বিশ্লেষণের প্রয়োজনে লেভি-স্ট্রস মিথিমগুলো নিম্নরূপে সারণিবদ্ধ করেছেন।

	১	২	৩	৪
১	ক্যাডমস কর্তৃক তাঁর অপহৃত বোন ইউরোপাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়া	স্পার্টোইদের একে অপরকে হত্যা করা	ক্যাডমস কর্তৃক ড্রাগন হত্যা	খোঁড়া রূপে ক্যাডমসের নাতি ল্যাবডাকসের জন্ম
২				খোঁড়া ল্যাবডাকসের পুত্র রূপে বামহাতি লেয়াসের জন্ম
৩				লেয়াসের পুত্ররূপে পা-ফোলা ইডিপাসের জন্ম
৪		ইডিপাসের হাতে তাঁর পিতা লেয়াসের খুনের ঘটনা	ইডিপাস কর্তৃক স্ফিংস হত্যা	
৫	ইডিপাস কর্তৃক মাকে বিবাহ	ইটিওক্লেস কর্তৃক ভাই পলিনাইসিসকে হত্যা		
৬	ইটিওক্লেসের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আন্তিগোনি কর্তৃক			

	ভাই পলিনাইসিসের মৃতদেহ সৎকার			

লেভি-স্ট্রস মিথিমগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত করে বলেছেন যে, এগুলো সারি অনুসারে আনুভূমিকভাবে পড়লে পুরো মিথটি ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যাবে। কিন্তু এগুলো কলাম অনুসারে উল্লম্বভাবে পড়লে নজরে পড়বে মিথিমগুলোর মধ্যকার এক আজব সম্পর্কের বুনন। এই সম্পর্কই মূলত মিথিমগুলোকে মিথের কাঠামোতে আবদ্ধ করেছে। কাঠামোবাদী বিশ্লেষণের কাজই হলো কাহিনি বা আখ্যানকে এভাবে এর ঘটনা-এককে বিশ্লিষ্ট করে এর কাঠামোগত স্বরূপটি তুলে ধরা এবং এর এককগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক নির্দেশ করা। উল্লম্বভাবে প্রদর্শিত মিথিমগুলোর মধ্যে লেভি-স্ট্রস যে আজব সম্পর্কের বুনন দেখিয়েছেন সে সম্পর্ক হলো প্রথম কলামের সাথে দ্বিতীয় কলামের এবং তৃতীয় কলামের সাথে চতুর্থ কলামের। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রথম কলামে যে মিথিমগুলো রয়েছে সেগুলো পারিবারিক সম্পর্কের বা রক্তের সম্পর্কের এক গভীর ও অতিমাত্রিক ঊর্ধগামী রূপের প্রকাশ। ক্যাডমস কর্তৃক বোনের খোঁজে দূর দেশে বেরিয়ে পড়া তাদের পারিবারিক গভীর এক বন্ধন ও সম্পর্কের প্রকাশ। ইডিপাস কর্তৃক মাকে বিবাহ যদিও ঘৃণ্য এক ঘটনা তবে তার মধ্য দিয়েও পূর্বতন মাতৃ সম্পর্ক আরো এক ধাপ এগিয়ে যে শরীরবৃত্তীয় গভীরতর সম্পর্কে প্রবেশ করেছে তা অস্বীকারের সুযোগ নেই। এই কলামের তৃতীয় মিথিম ইটিওক্লেসের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জীবনের বিনিময়ে আন্তিগোনি কর্তৃক ভাই পলিনাইসিসের মৃতদেহ সৎকারের ঘটনাও একইভাবে কঠিন এক অতিমাত্রিক পারিবারিক বা রক্তের সম্পর্কের প্রকাশ। এই কলামের সাথে সম্পূর্ণ বৈপরীত্যের সম্পর্কে রয়েছে দ্বিতীয় কলাম। দ্বিতীয় কলামের প্রতিটি মিথিম পারিবারিক সম্পর্কহীনতা বা অতিমাত্রিক নিম্নগামিতার এক ঘৃণ্য রূপ প্রকাশ করছে। একই ড্রাগনের দাঁত থেকে উৎপন্ন স্পার্টোইরা অনেকটা সহোদরা হয়েও একে অপরকে হত্যায় লিপ্ত হয়েছে। ইডিপাস পুত্র হয়ে পিতাকে হত্যা করেছে। ইটিওক্লেস সহোদর ভাইকে হত্যা করেছে। পারিবারিক সম্পর্কের এর চেয়ে নিম্নতর ও জঘন্য কোনো রূপ হতে পারে না। এভাবে লেভি-স্ট্রস পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দুই কলামের মিথিমগুলোর মধ্যকার বৈপরীত্যের সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন।

একইভাবে বৈপরীত্যের সম্পর্ক বিদ্যমান তৃতীয় ও চতুর্থ কলামের মধ্যে। এই বৈপরীত্যের ভিত্তি হলো ভূ-উদ্ভূত অস্তিত্বের (Chthonic existence) স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি। এখানে তৃতীয় কলামে রয়েছে ভূ-উদ্ভূত দুটি প্রাণীর নাম: ড্রাগন ও স্ফিংস। দুটোই নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে ভূ-উদ্ভূত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। চতুর্থ কলামে এই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। চতুর্থ কলামে উল্লিখিত তিনজন মানুষই হাঁটার সমস্যায় ভুগছে। ল্যাবডাকস খোঁড়া, লেয়াস বামহাতি বিধায় ডানপায়ে কম শক্তিসম্পন্ন এবং ইডিপাস পা-ফোলা। ভূ-উদ্ভূত প্রাণীরা কিংবা দেবতারা বুকে ভর দিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং হাঁটতে সমস্যা বোধ করে। ল্যাবডাকস, লেয়াস ও ইডিপাসের হাঁটার এই সমস্যা ইঙ্গিত দেয় যে তাঁরা ভূ-উদ্ভূত অস্তিত্ব এবং তাদের অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে ভূ-উদ্ভূত অস্তিত্বকে স্বীকার করা হচ্ছে।

মিথোলজির পারোল-রূপ উদাহরণ থিবিসীয় এই মিথকে মিথিম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেভি-স্ট্রস যেভাবে কলামগত সম্পর্কের কাঠামোতে দাঁড় করালেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপে তুলে ধরা যায়:

পারিবারিক বা রক্তের সম্পর্কের অতিমাত্রিক মূল্যায়ন (কলাম-১)	ভূ-উদ্ভূত অস্তিত্বকে অস্বীকার (কলাম-৩)
পারিবারিক বা রক্তের সম্পর্কের অতিমাত্রিক অবমূল্যায়ন (কলাম-২)	ভূ-উদ্ভূত অস্তিত্বকে স্বীকার (কলাম-৪)

এবারে প্রশ্ন হলো ইডিপাস-মিথ-রূপ পারোলের অন্তস্থ সম্পর্কের এই কাঠামো তৎকালীন সমাজকাঠামোর সাথে কীভাবে সংশ্লিষ্ট। সমাজকাঠামোর সাথে মিথের এই কাঠামোর সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে লেভি-স্ট্রস বলছেন যে, এই মিথের অন্তস্থ মিথিমগুলোর আন্তসম্পর্ক তখনকার সমাজ-মানসে সুপ্তভাবে বিদ্যমান মানবের উদ্ভব বিষয়ক প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করছে। মানুষের উদ্ভব যৌনমিলন থেকে নাকি ভূ-উদ্ভূত অস্তিত্ব থেকে সে বিষয়ে সেই সমাজের জনগণ স্থির ধারণায় আসতে পারছিল না। ফলে রক্তের সম্পর্কের বিষয়েও তাদের বিরোধাত্মক ভাবনা ছিল এবং ভূ-উদ্ভব বিষয়েও তাদের বিরোধাত্মক ভাবনা ছিল। সারণির প্রথম কলাম রক্তের সম্পর্ক অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে মানুষের উদ্ভব যৌনমিলন থেকে হওয়ার বিষয়ে সায় দিচ্ছে। আবার দ্বিতীয় কলাম রক্তের সম্পর্ককে অবমূল্যায়নের মাধ্যমে মানুষের উদ্ভব যৌনমিলন থেকে হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করছে। একইভাবে তৃতীয় কলাম মানুষের ভূ-উদ্ভূত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করছে এবং চতুর্থ কলাম মানুষের ভূ-উদ্ভূত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করছে। সারণির প্রথম কলামের সাথে দ্বিতীয় কলামের এবং তৃতীয় কলামের সাথে চতুর্থ কলামের বিরোধ তখনকার সমাজ-মানসের উপরোক্ত বিরোধাত্মক ভাবনারই প্রকাশ।

মিথটি অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সমাধান দেয় না। মানুষের উদ্ভব যৌনমিলন থেকে নাকি ভূ-উদ্ভূত অস্তিত্ব থেকে অর্থাৎ মানুষের উদ্ভব দুয়ের মিলন থেকে নাকি একক কোনো অস্তিত্ব থেকে সে বিষয়ে মিথটি কোনো সিদ্ধান্ত দেয় না। এ বিষয়ে যে তখনকার সমাজে পরস্পর বিরোধী ভাবনা বিদ্যমান ছিল মিথটি তাই শুধু উচ্চারণ করে। মিথটির পুরো ইঙ্গিতার্থকে নিম্নের সমীকরণে প্রকাশ করা যায়:

জন্ম যৌনমিলনের ফসল ——— মানবের জন্ম যৌনমিলনের ফসল নয়

⇨

মানব ভূ-উদ্ভূত অস্তিত্বের ফসল নয় ——— মানব ভূ-উদ্ভূত অস্তিত্বের ফসল

পারোল রূপ ইডিপাস মিথটিকে এভাবে কাঠামোতে ফেলে বিশ্লেষণ করে লেভি-স্ট্রস যে অর্থে পৌছেছেন সেটিই মূলত এ সংক্রান্ত মিথোলজির লাঙ (Langue)। অর্থাৎ মিথিমগুলোর আন্তসম্পর্ক আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে মিথের বৃহত্তর কাঠামোতে যে কাঠামোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তখনকার সমাজচিত্র আর সেই বৃহত্তর কাঠামোটিই হলো এর লাঙ। কাঠামোবাদী সমালোচনার কাজ হলো এভাবে কোনো আখ্যানের উপাদানসমূহ সজ্জিতকরণের মাধ্যমে তার অন্তস্থ কাঠামোটি দৃশ্যমান করে তোলা এবং সেই কাঠামোর অন্তস্থ উপাদানসমূহের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট আখ্যানের পারোল-রূপ কাঠামোর সাথে বৃহত্তর লাঙ-রূপ কাঠামোর সম্পর্ক নির্দেশ করা ও প্রতিষ্ঠা করা।

পোস্টস্ট্রাকচারালিজম বা বিনির্মাণবাদ

স্ট্রাকচারালিজম বা কাঠামোবাদের তাত্ত্বিক ধারায় অগ্রসর হতে হতেই জন্ম নিয়েছে পোস্টস্ট্রাকচারালিজম বা বিনির্মাণবাদ। তবে দুঃখজনকভাবে স্ট্রাকচারালিজম যা বলে পোস্টস্ট্রাকচারালিজম বা বিনির্মাণবাদ বলে প্রায় পুরোটাই তার উল্টো কথা। স্ট্রাকচারালিজমের পথ ধরে এগোতে এগোতে এই উল্টোকথার পোস্টস্ট্রাকচারালিজমের খোঁজ যিনি আমাদেরকে প্রথম দিয়েছিলেন তিনি হলেন রোলাঁ বার্থ (Roland Barthes)। ১৯৬৩ সালে স্ট্রাকচারালিজমের তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি লেখেন 'সুর রাসিন' (Sur Racine = রাসিন বিষয়ে)। বইটি সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার জাঁ রাসিন বিষয়ক একটি আলোচনা। স্ট্রাকচারালিজমের তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি এই আলোচনা করেছেন। তাই এ পর্যন্ত তাঁকে আমরা কাঠামোবাদী সমালোচক হিসেবেই দেখি। কিন্তু ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর একটি প্রবন্ধ যার শিরোনাম 'ডেথ অব দি অথর'। এই প্রবন্ধে আমরা দেখি যে, রোলাঁ বার্থ স্ট্রাকচারালিজমের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করে যেখানে পৌঁছেছেন সেখানে স্ট্রাকচারালিজম পৌঁছায় না। মূলত স্ট্রাকচারালিজমের গন্তব্যই ওটা হওয়ার কথা না।

স্ট্রাকচারালিজম আখ্যানের অন্তস্থ স্ট্রাকচার বা কাঠামো খোঁজে। সে কাঠামো পাঠককে পৌঁছে দেয় আখ্যানের অন্তস্থ অর্থের নিকট যে-অর্থ আখ্যানকে সম্পর্কিত করে তোলে জীবন ও জগতের অন্যান্য তাৎপর্যময় কাঠামোর সাথে। এই কাঠামোর অন্বেষণ প্রথম শুরু হয় সিগনিফায়ারগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক-কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। সিগনিফায়ার পরে বৃহত্তর কাঠামো পারোলের সাথে সম্পর্কিত হয়। পারোল পরে আবার যুক্ত হয় বৃহত্তর কাঠামো লাঙের সাথে। এভাবে প্রতি স্তরে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পৌঁছতে হয় আখ্যানের অভীষ্ট অর্থে। সুতরাং কাঠামোবাদী তত্ত্বে আবশ্যিকভাবে ধারণা করা হয় যে, আখ্যানে বা টেক্সটে অর্থের নির্দিষ্টতা আছে যে নির্দিষ্ট অর্থটি লেখক ও পাঠক উভয়েরই লক্ষ্য। কিন্তু রোলাঁ বার্থ সাইন, সিগনিফায়ার আর সিগনিফায়েড সংক্রান্ত ধারণাসমূহ সাথে নিয়ে এগোতে এগোতে 'ডেথ অব দি অথর' লেখার পর্যায়ে গিয়ে দেখলেন সিগনিফায়ারের সাথে অন্য হাজারো সিগনিফায়ারের বৈপরীত্যের সম্পর্ক এত অসংখ্য যে সে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কোনো সিগনিফায়ারের নির্দিষ্ট অর্থে পৌঁছা অসম্ভব। আর লেখকের পক্ষে কোনো সিগনিফায়ার অর্থাৎ কোনো শব্দ দ্বারা তাঁর উদ্দিষ্ট কোনো অর্থ বোঝানোর তো সুযোগই নেই। কেননা, সস্যুর তো দেখিয়েই দিয়েছেন যে, কোনো সিগনিফায়ার নিজের মধ্যে তো অর্থ ধারণ করে না, অর্থ তো থাকে সেই সিগনিফায়ারের সাথে অন্য সিগনিফায়ারসমূহের সম্পর্কের মাঝে। সে সম্পর্ক লেখকের সর্বরকম কর্তৃত্বের বহির্ভুত এক বিষয়। সে সম্পর্ক সিগনিফায়ারদের নিজেদের আচরণের অধীন, সেখানে লেখকের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। লেখক না পারেন সিগনিফায়ার সৃষ্টি করতে, না পারেন সিগনিফায়ারদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে কোনো দূতিয়ালি করতে। ফলে লেখা পড়তে গিয়ে লেখকের উদ্দিষ্ট অর্থ খোঁজা তো দূরে থাক, লেখক প্রসঙ্গটাই অর্থাৎ লেখকের অস্তিত্বটাই একটি অলীক কল্পনা হয়ে দাঁড়ায়। বার্থ অবশ্য এটাকে অলীক কল্পনা না বলে বলেছেন বুর্জোয়া কল্পনা (bourgeois fiction)। উল্লেখ্য যে, বার্থ 'অথর' বলতে যাকে বুঝিয়েছেন তাকে আমরা এখানে লেখক বলছি। তাঁর মতে অথর হলেন তিনি যাঁকে টেক্সটের 'অথরিটি' জ্ঞান করা হয়। এই অথরকে বার্থ রাইটার থেকে আলাদা করেছেন। বার্থ তাঁর 'ডেথ অব দি অথর'- এর বক্তব্যে অথরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও রাইটারের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বার্থের ধারণায় রাইটার হলেন নেহায়েত একজন নকলনবিশ বা অনুলিপিকার। মুহুরি বললেও খারাপ হয় না।

রোলাঁ বার্থের এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সাহিত্যতত্ত্বে দুটো বিপর্যয়কর ধারণা এসে প্রবেশ করেছে। প্রথমত, লেখক লেখার মধ্যে কোনো নিজস্ব অর্থ সৃষ্টি করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, সিগনিফায়ারদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংখ্যা এত অসংখ্য যে সিগনিফয়ারগুলো কোনো সিগনিফায়েডে মূলত পৌঁছতেই পারে না। অর্থাৎ শব্দ কোনো নির্দিষ্ট অর্থই দিতে পারে না। এই দুটো ধারণা দ্বারাই মূলত সাহিত্যে

পোস্টস্ট্রাকচারালিজম বা বিনির্মাণবাদ তত্ত্ব সূচিত হয়েছে। বার্থ কর্তৃক সূচিত বিনির্মাণবাদের এই ভাবনাবীজ জ্যাক দেরিদার (Jacques Derrida) হাতে এসে পুরো এক সমালোচনাতত্ত্বের রূপ লাভ করেছে।

বার্থের 'অথর' বা লেখক সম্পর্কিত ভাবনার সূত্র ধরে দেরিদা কীভাবে এগোলেন আমরা প্রথমে সেটিই দেখি। বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য দেরিদা ফিরে গেলেন সস্যুরের নিকট। আমরা সাধারণ পাঠক সাধারণভাবে ভেবে থাকি যে, লেখা যেহেতু লেখকের সেহেতু সে লেখার সকল অর্থের মালিক ও নির্মাতা তো লেখকই হবেন। অর্থাৎ আমরা সকলেই ধরে নিই যে, লেখক নামের একজন স্বাধীন মানুষ লেখার বাইরে বসে লেখাটির সকল অর্থ নির্মাণ ও নিরূপণ করে থাকেন। দেরিদা বার্থের মতো এই লেখকের অস্তিত্ব অস্বীকার না করে লেখক কর্তৃক নির্মেয় অর্থের এক বিশেষ নামকরণ করেছেন। সস্যুরের সিগনিফায়ার ও সিগনিফায়েড ধারণার সাথে সম্পৃক্ত করে তিনি এই অর্থের নাম দিয়েছেন ট্রান্সেন্ডেন্টাল সিগনিফায়েড (transcendental signified), অর্থাৎ আসমানি অর্থ। আসমানি অর্থ বলেই জমিনের মানুষের সাথে এই প্রকার অর্থের কখনো দেখা হওয়ার সুযোগ নেই।

এভাবে লেখককে কোনো লেখার অর্থের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আসমানে পাঠিয়ে দিয়েই দেরিদা ক্ষান্ত হলেন না। নিজ অর্থ সাথে নিয়ে লেখক আসমান থেকে যেন কখনো নামতে না পারেন সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তিনি সস্যুরের সিগনিফায়ার ও সিগনিফায়েডের তত্ত্ব নিয়ে আরো ব্যাখ্যায় অগ্রসর হলেন। এই ব্যাখ্যায় তিনি ব্যবহার করলেন তাঁর নির্মিত এক নতুন শব্দ 'ডিফেরঁস' (differance)। শব্দটি তিনি বানিয়েছেন দুটি ফরাসী শব্দ জোড়া দিয়ে। ইংরেজিতে তাদের একটির অর্থ to differ এবং অন্যটির অর্থ to defer। বাংলায় একটির অর্থ ভিন্ন হওয়া এবং অপরটির অর্থ দেরি হওয়া। দেরিদা দেখালেন যে, সিগনিফায়ার ও সিগনিফায়েডের ধারণার মধ্য দিয়ে সস্যুরিয় পদ্ধতিতে টেক্সটের অর্থ খুঁজতে গেলে to differ এবং to defer- এই দুটি ধারণার চক্রেই নিপতিত হতে হয়। প্রথমত to differ- এর ধারণা তো সস্যুরই দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন সিগনিফায়ারদের অর্থাৎ শব্দদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, তাদের অর্থ তৈরি হয় অন্য সিগনিফায়ারদের সাথে সংশ্লিষ্ট সিগনিফায়ারটির ভিন্নতার মধ্য দিয়ে। এভাবে to differ বা ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি অর্থ তৈরির ক্ষেত্রে আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থ তৈরিতে দ্বিতীয় ধারণাটি অর্থাৎ to defer- বা দেরি হওয়ার ধারণাটি প্রথম ধারণাটির ফলাফল বা ফসল। ধরা যাক 'ক' একটি সিগনিফায়ার। সস্যুরের to differ- এর ধারণা অনুযায়ী টেক্সটে সিগনিফায়ার 'ক' এর অর্থ বা সিগনিফায়েড তো 'ক' এর নিজের মধ্যে থাকবে না, বরং সে অর্থ থাকবে সিগনিফায়ার 'খ'-এর সিগনিফায়েড থেকে তার ভিন্নতার (to differ) মধ্যে। ফলে 'ক' এর সিগনিফায়েডের খোঁজে নামলে অপেক্ষা করতে হবে 'খ'-এর সিগনিফায়েড পাওয়ার জন্য। কিন্তু সেই একই সস্যুরিয় ধারণা অনুযায়ী 'খ' এর সিগনিফায়েডও তো তার নিজের মধ্যে থাকবে না, তার সিগনিফায়েড থাকবে 'সিগানফায়ার 'গ' এর সিগনিফায়েড থেকে তার ভিন্নতার মধ্যে। তখন গ এর সিগনিফায়েড বা অর্থ খুঁজতে অপেক্ষা করতে হবে 'ঘ' এর সিগিনিফায়েডের জন্য। এভাবেই এক সিগিনফায়ার থেকে আরেক সিগনিফায়ারের দিকে দৌড়াতে হবে সিগনিফায়ার 'ক' এর অর্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য এবং সে দৌড় কখন শেষ হবে কোনো পাঠকের তা জানা নেই। ফলে সস্যুরিয় to differ- নীতিতে অর্থ তৈরিতে বা অর্থ খুঁজে পেতে খালি দেরি হবে তাই নয়, আদৌ কখনো অর্থ খুঁজে পাওয়ার গ্যারান্টিই থাকবে না। ফলে সস্যুরিয় সাইন-সিগনিফায়ার-সিগনিফায়েড সংক্রান্ত ধারণা অনুযায়ী টেক্সটের অর্থ খুঁজতে গেলে অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে to differ এবং to defer- এর চক্রে নিপতিত হতে হবে। to differ এবং to defer- এর এই দুই ধারণাকে একত্র করে দেরিদা এই চক্রের নাম দিয়েছেন 'ডিফেরঁস' (differance)।

'ডিফেরঁস'-এর মধ্য দিয়ে অর্থ খোঁজার এই অন্তহীন যাত্রাই বিনির্মাণবাদের সার কথা। এই যাত্রায় দেরিদার সাথী হতে হলে আরো কয়েকটি ধারণার সাথে পরিচিত হতে হবে। তার একটির নাম ট্রেস (trace)। উপরে যেমনটা বলা হলো যে এক সিগনিফায়ারের অর্থ খুঁজতে যখন আরেক সিগনিফায়ারের কাছে যাবো তখন দেখবো সেই সিগনিফায়ারের অর্থ রয়ে গেছে আরেক সিগনিফায়ারের কাছে। এমন হাজার সিগনিফায়ারের মধ্যস্থিত আমাদের না-দেখা ও না-পাওয়া যে-সকল উপাদান বা সত্ত্বার ওপর আমাদের প্রথম সিগনিফায়ারের অর্থ নির্ভরশীল সেই সত্ত্বা বা উপাদানকে দেরিদা নাম দিয়েছেন ট্রেস। টেক্সটে এই ট্রেসদের উপস্থিতি ভূতের মতো; এদের কথা বলা হয়, এদের কথা ভাবা হয় কিন্তু এদেরকে কখনো চোখে দেখা যায় না। এই ধারণার মধ্য দিয়ে দেরিদা বলেছেন যে, টেক্সটের অর্থ খোঁজার দৌড়ে তোমার সাথে শুধু দেখা হবে সিগনিফায়ারদের পারস্পরিক ভিন্নতার সাথে এবং ট্রেসের সাথে, আর কিছুর সাথে নয়।

এভাবে অর্থ খোঁজা একেবারেই ভূতের পিছনে দৌড়ানো, একটু ভদ্রভাবে বলা যায় আলেয়ার পিছনে দৌড়ানো। আলেয়া যেমন কতক্ষণ এখানে দেখা যায় তো পরক্ষণেই দেখা যায় সেখান থেকে অনেক দূরে অন্য কোনোখানে। এ দৌড়েও তেমনি অর্থ এখন দেখা যায় ঐ সিগনিফায়ারের মধ্যে, আবার পরক্ষণেই দেখা যায় দূরের আরেক সিগনিফায়ারে। কিন্তু আসলে অর্থ নেই এদের কোথাও, আছে শুধু ট্রেস আর ডিফেরঁস। তাই অর্থের এই দৌড় মূলত এক গোলক ধাঁধা দেরিদা যার নাম দিয়েছেন এ্যাপোরিয়া (Aporia)। কাঠামোবাদীরা এই গোলক ধাঁধা থেকে সহজ মুক্তির জন্য সিগনিফায়ারকে বিপরীতার্থক দ্বিপদে (oppositional binary) সাজায় যাতে দৌড়টা ঐ দুই পদের সম্পর্কের মধ্যে আটকানো যায়। আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি ক্লদ লেভি-স্ট্রসও মিথিমগুলোকে বিপরীতার্থক দ্বিপদী বিন্যাসে সাজিয়ে তাঁর কাঠামোবাদী আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন।

দেরিদা এই দৌড়কে এ্যাপোরিয়া থেকে মুক্ত করতে এক ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর সেই পথটি দেখার জন্য আমরা কাঠামোবাদীদের বিপরীতার্থক একটি দ্বিপদ নিয়ে অগ্রসর হবো। ধরা যাক আলো ও অন্ধকার। কাঠামোবাদীরা এই দুয়ের বৈপরীত্যের

সম্পর্ক প্রদর্শন করতে প্রথমে আলো দিয়ে শুরু করে, কারণ সেখানে একটা কিছুর উপস্থিতি আছে যা দ্বিতীয়টিতে অনুপস্থিত বলে সেটি অন্ধকার। মানে হলো আলো দ্বারা একটি উপস্থিতি বোঝায় আর অন্ধকার দ্বারা সেটির অনুপস্থিতি বোঝায়। এই উপস্থিতিটিকে কাঠামোবাদীরা অনপনেয় (immutable) এবং স্বাধীন-সত্ত্বায় আত্মস্থিত (self-contained) হিসেবে দেখেন। এই উপস্থিতিকে কাঠামোবাদীরা তাদের বিপরীতার্থক দ্বিপদের অর্থের কেন্দ্র হিসেবে দেখেন। দেরিদা তেমনটা দেখেন না। তিনি এটাকে কেন্দ্র ভাবা দূরের কথা, এটাকে তিনি বাস্তবই ভাবেন না। তিনি এটাকে ভাবেন অধিবাস্তব। তাই এর নামও দিয়েছেন metapysics of presence। দেরিদা মূলত কাঠামোবাদীদের সৃষ্ট অর্থের এই কেন্দ্রগুলোকে ভাঙার ব্রত নিয়েই বিনির্মাণবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। বিনির্মাণ (deconstruction) শব্দের মানেও হলো নির্মাণে যা করা তার উল্টোটা করা অর্থাৎ নির্মিত বস্তুকে ভেঙে ভেঙে তার মূলে ফিরিয়ে নেয়া যাতে কেন্দ্রের অস্তিত্ব বলতে আর কিছু না থাকে। দেরিদা এই কেন্দ্র কীভাবে ভাঙছেন তা বুঝতে আলো ও অন্ধকারের দ্বিপদেই আবার ফিরে আসি। আলো ও অন্ধকারের অর্থের কেন্দ্র গুড়িয়ে দেয়া বা বিনির্মাণের কাজে দেরিদার পথে আগালে আমাদেরকে প্রথমেই আঘাত করতে হবে যার উপস্থিতিতে আলো হয় এবং যার অনুপস্থিতিতে অন্ধকার হয় সেই অধিবাস্তব উপস্থিতির ওপর। এই অধিবাস্তব উপস্থিতিকে বা উপস্থিতির ভূতকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে 'আলো-অন্ধকার' দ্বিপদের অর্থের কেন্দ্রে আলো আর থাকছে না। এবার আমরা কৃষ্ণ গহ্বরের ধারণার সাথে সম্পর্কিত করে বলতে পারি অন্ধকার হলো সেই গ্রাসী ক্ষমতা যা আলোকে গিলে ফেলতে পারে যেমনটা কৃষ্ণগহ্বরে ঘটে। এভাবে এই দ্বিপদের পূর্বতন অর্থকেন্দ্র বিনির্মিত হলো বা গুড়িয়ে গেল এবং দ্বিপদী সম্পর্কে অন্ধকারের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা পেল অর্থাৎ অর্থের কাঠামোতে অন্ধকার সক্রিয় (active) হয়ে উঠলো এবং আলো নিষ্ক্রিয় (passive) হয়ে গেল। এভাবে পুরনো বা সনাতন অর্থকাঠামোকে গুড়িয়ে দিয়ে নতুন নতুন অর্থকাঠামোর সন্ধান দেয়াই বিনির্মাণবাদের কাজ। যদিও এ কাজের সীমান্তে এ্যাপোরিয়ার শঙ্কা রয়েছে অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত কোনো অর্থে পৌঁছতে না পারার নিশ্চিত ভবিতব্য রয়েছে, তারপরও এর মধ্যে পুরনো অর্থ ভাঙার আনন্দ এবং নতুন নতুন অর্থের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে বিধায়ই দুনিয়া জুড়ে এ তত্ত্বের এত জয়জয়কার।

বিনির্মাণবাদী তত্ত্বে আরেকজন চিন্তকের বড় অবদান আছে। তিনি হলেন মিশেল ফুকো (Michel Foucault)। ফুকোর দুটি বিশেষ ভাবনা বিনির্মাণবাদী তত্ত্বে খুব উচ্চারিত দুটি প্রসঙ্গ। একটি হলো লেখক বা অথর সম্পর্কিত ফুকোর ভাবনা এবং অপরটি হলো অর্থের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ক ভাবনা যা ফুকো ব্যক্ত করেছেন তাঁর ডিসকোর্স সংক্রান্ত ভাবনা-বলয়ে। লেখক বা অথর সম্পর্কে বার্থ ও দেরিদার ভাবনার সাথে আমরা ইতোমধ্যেই পরিচিত হয়েছি। বার্থ লেখকের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাকে এক ধরনের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আর দেরিদা বলেছেন লেখকের অস্তিত্ব থাকলেও এবং লেখায় তার অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকলেও সে এক আসমানি বিষয় (transcendental signified), কারণ পাঠকের সাথে সেই অর্থের কখনো দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। বার্থ ও দেরিদার এই জাতীয় ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে ফুকো লেখক সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা হাজির করেছেন।

ফুকোর 'What is an Author' শীর্ষক প্রবন্ধ অনুযায়ী লেখককে আমরা দুইভাবে বা দুই রূপে বুঝি। এক হলো ব্যক্তি লেখক যাঁকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া যায়, আরেক হলো লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যগত সমধর্মিতার সমন্বয়রূপ এক অস্তিত্ব যাঁকে আমরা আঙুল দিয়ে দেখাতে পারি না, তবে লেখাগুলোর বৈশিষ্ট্যগত সমধর্মিতার মাঝে যাঁর অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি। লেখকের এই দ্বিতীয় রূপকে তিনি বলেছেন 'অথর ফাংশন' (author function)। প্রথম রূপে লেখকের পরিচয় হলো তাঁর নাম (designation), দ্বিতীয় রূপে লেখকের পরিচয় হলো তাঁর চিন্তা, তাঁর সময়, তাঁর সমাজকাঠামো ইত্যাদি অনেক বিষয়ের একটি দীর্ঘ বিবরণ (description)। ফুকোর মতে প্রথম রূপের লেখককে তাঁর লেখার অর্থের জন্য প্রয়োজন না হলেও দ্বিতীয় রূপের লেখককে অর্থাৎ author function বা descriptive author- কে লেখার অর্থের জন্য প্রয়োজন। ফুকোর মতে এই অথর ফাংশনকে অস্বীকার করলে বিনির্মাণবাদী অর্থ সন্ধানের অভিযাত্রায় আমরা পৌঁছে যেতে পারি বড় বিপর্যয়কারী ডিসকোর্সে (transgressive discourse) কিংবা বিপজ্জনক কোনো অর্থে (proliferation of dangerous meaning) যা চূর্ণ করে দিতে পারে আমাদের এযাবৎ কালের অর্জিত সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা। মনসুর আল হাল্লাজের 'আনাল হক' বাক্যের অমন বিপজ্জনক অর্থ করা হয়েছিল বিধায়ই তাঁকে শরিয়তপন্থীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। অথর সম্পর্কিত এই ভাবনা দ্বারা ফুকো বিনির্মাণবাদের দেরিদিয় অর্থ সন্ধানের গন্তব্যহীন ছুটন্ত ঘোড়াটির একটু হলেও লাগাম কষে ধরতে পারলেন। সেই সাথে ফুকোর ডিসকোর্স সম্পর্কিত বক্তব্য দ্বারা তিনি বিনির্মাণবাদের অর্থবলয়কে আরো কিছুটা গণ্ডীবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

ফুকোর বক্তব্যমতে সব টেক্সটই ডিসকোর্স, সব ডিসকোর্সই জ্ঞানের বাহন, আর সব জ্ঞানই ক্ষমতা চর্চার কৌশল। ফলে সব টেক্সটই ধারণ করে ক্ষমতাধরদের ক্ষমতা চর্চার চিত্র কিংবা বলা যায় টেক্সটগুলো বা ডিসকোর্সগুলো হলো সেই ভূমি (terrain) যেখানে এই ক্ষমতা চর্চার কার্যগুলো সম্পন্ন হচ্ছে। তাই টেক্সটের অর্থ খুঁজতে উক্ত টেক্সটের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা-কাঠামোর কথা বিবেচনায় নিতেই হবে। অর্থটি উক্ত ক্ষমতা-কাঠামো দ্বারা সমর্থিত না হলে তা গ্রহণ করা যাবে না এবং তা ট্যাবু বা মস্তিষ্কবিকৃতির ফল বলে গণ্য হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। The Order of Discourse প্রবন্ধে ফুকো বলেছেন যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতকাঠামো দ্বারা সমর্থিত না হলে কোনো নির্দিষ্ট ডিসকোর্স বা ডিসকোর্সের অর্থ ট্যাবু হবে বা মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে। আবার ক্ষমতা-কাঠামোর নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা সমর্থিত না হলেও কোনো ডিসকোর্স বা তার অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামো এবং অথর ফাংশন দ্বারা ফুকো বিনির্মাণবাদী অর্থ-সন্ধান অভিযাত্রাকে একটি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছেন। ফলে বলা যায় বিনির্মাণবাদ ফুকোর হাতে তত্ত্ব হিসেবে অধিকতর গ্রহণীয় রূপ লাভ করেছে। সাথে লেখার সাথে সামাজিক রাজনৈতিক

ক্ষমতাকাঠামোকে সম্পৃক্ত করে তিনি সমালোচনাতত্ত্বের সেই ধারাকেও শক্তিশালী করেছেন যে তত্ত্বগুলো লেখার প্রসঙ্গকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। আর আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি যে, লেখা, লেখক আর পাঠক বাদ দিয়ে লেখার প্রসঙ্গকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যে সকল সমালোচনাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাদের মধ্যে মার্কসীয় সমালোচনা তত্ত্ব অন্যতম।

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিক ভিত্তি হলো এই নীতি ও বিশ্বাস যে, কোনো সাহিত্যকর্ম আলোচনার ক্ষেত্রে উক্ত সাহিত্যকর্মের লেখক, পাঠক বা লেখার বিষয় নিয়ে ভাবিত হওয়ার খুব প্রয়োজন নেই; বরং ভাবতে হবে সাহিত্যকর্মটিতে বিবৃত ও বিধৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে। মার্কসীয় সমালাচনাতত্ত্বে কেন এমনটা ভাবতে হয় তার উত্তর রয়েছে মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) উচ্চারিত বিখ্যাত এক আপ্ত বাক্যে যেখানে মার্কস বলেছেন- 'মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নিরূপণ করে না, বরং তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে' (It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness)। সাহিত্য যেহেতু চেতনা থেকে উদ্ভূত এবং সেই চেতনা যেহেতু সামাজিক অস্তিত্ব অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত সেহেতু সাহিত্য বিশ্লেষণের আবশ্যিক দায় হলো আখ্যানের সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার বিচার। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আখ্যানটি বড় নয়, বরং আখ্যানটির সাথে সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাই বড়। অর্থাৎ টেক্সট বড় নয়, বরং কনটেক্সটই বড়।

মার্কস উপরের বাক্যটিতে 'সামাজিক' (social) শব্দ ব্যবহার করলেও, তাঁর তত্ত্বমতে সামাজিক সকল বাস্তবতা নির্মিত ও নিরূপিত হয় অর্থনীতি দ্বারা। ফলে তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী সাহিত্যকর্ম বিচারের কাজে সামাজিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ মূলত সম্ভব হবে অর্থনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই। আর এ কথা তো আমরা জানিই যে, ফ্রয়েড যেমন জীবন ও জগৎকে একমাত্র যৌনতা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, মার্কস তেমনই জীবন ও জগৎকে একমাত্র উৎপাদনব্যবস্থা বা অর্থনীতি দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কীভাবে অর্থনীতি দিয়ে জীবন ও জগতের সবকিছু বিশ্লেষণের প্রয়াস পেলেন তা বোঝার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই বুঝতে হবে দুটি অতি পরিচিত শব্দ- বেইজ স্ট্রাকচার (base structure) ও সুপার স্ট্রাকচার (super structure)।

জীবন ও জগতের পূর্ণ কাঠামোটিকে মার্কসীয় ধারণায় বেইজ স্ট্রাকচার ও সুপার স্ট্রাকচার নামে দুইভাগে ভাগ করা হয়। দুইভাগেরই কেন্দ্রে রয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থা। মূলত মার্কসীয় সব ধারণার মূলেই রয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থা। বেইজ স্ট্রাকচার বা ভিত কাঠামো রচিত হয় উৎপাদনের সাহায্যকারী উপাদান এবং উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট জনতার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা। উৎপাদনের সাহায্যকারী উপাদানের মধ্যে রয়েছে যন্ত্রপাতি, কারখানা, ভূমি, কাঁচামাল ইত্যাদি। উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট জনতার পারস্পরিক সম্পর্ক বাৎলে দেয় সংশ্লিষ্ট জনতার মধ্যে কারা প্রলেতারিয়েত, কারা উঁচু জাতের কর্মী বা লেবার এ্যারিস্টোক্রেসি, কারা বুর্জোয়া, বা কারা পেটি বুর্জোয়া, কারা ভূমিদাস, কারা ভূস্বামী ইত্যাদি; এবং একই সাথে বাৎলে দেয় এই প্রলেতারিয়েত, লেবার এ্যারিস্টোক্রেসি, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া, ভূমিদাস, ভূস্বামী প্রমুখের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কটি কেমন। উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট এই দুটি দিক অর্থাৎ উৎপাদনের সাহায্যকারী উপাদান (means of production) এবং উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট জনতার পারস্পরিক সম্পর্ক (relations of production) নির্ণয় ও নির্ধারণ করে দেয় সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থাটি কোন ধরনের- সেটি পুঁজিবাদী, নাকি সমাজতান্ত্রিক, নাকি সামন্ততান্ত্রিক, নাকি কম্যুনিস্টপন্থী। এক কথায় উৎপাদনের সাহায্যকারী উপাদান (means of production) এবং উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট জনতার পারস্পরিক সম্পর্ক (relations of production) গঠন করে সমাজব্যবস্থার বেইজ স্ট্রাকচার এবং বেইজ স্ট্রাকচার নির্দিষ্ট করে বলে দেয় সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থাটি কোন ধরনের- সেটি পুঁজিবাদী, নাকি সমাজতান্ত্রিক, নাকি সামন্ততান্ত্রিক, নাকি কম্যুনিস্টপন্থী।

একটি সমাজব্যবস্থায় যা কিছু থাকে তা থেকে উপরে উল্লিখিত বেইজ স্ট্রাকচারের উপাদানটুকু বাদ দিলে অবশিষ্ট যা থাকে তা সবই সেই সমাজব্যবস্থার সুপারস্ট্রাকচারের অংশ। উদাহরণ দিয়ে বলতে গেলে পরিবার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, প্রচার মাধ্যম, পুলিশ, বিচারপদ্ধতি, প্রশাসন ইত্যাদি সবই একটি সমাজব্যবস্থার সুপারস্ট্রাকচার। মার্কসীয় ধারণামতে সমাজের সুপারস্ট্রাকচার কী হবে এবং কেমন হবে তা নির্ধারিত হবে তার বেইজ স্ট্রাকচার দ্বারা। আমরা খুব সহজেই বুঝি যে, উৎপাদন ব্যবস্থার বেইজ স্ট্রাকচারের ভিত্তিতে যে সমাজটি পুঁজিবাদী রূপে প্রতিষ্ঠিত সে সমাজটির শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্মচর্চা, পুলিশ প্রশাসন, বিচার পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই সেই সমাজব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হবে যে সমাজব্যবস্থাটি তার উৎপাদন ব্যবস্থার বেইজ স্ট্রাকচারের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক রূপে প্রতিষ্ঠিত। মার্কসীয় বেইজ স্ট্রাকচার ও সুপারস্ট্রাকচারের ধারণা এভাবে প্রতিষ্ঠা করে যে, সমাজব্যবস্থার সুপারস্ট্রাকচার নিয়ন্ত্রিত হয় এর বেইজ স্ট্রাকচার দ্বারা। বেইজ স্ট্রাকচারটি যেহেতু সম্পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থার স্ট্রাকচার, আর সেই উৎপাদন ব্যবস্থার স্ট্রাকচারটিই যেহেতু সমাজের সুপারস্ট্রাকচার নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু বলা যায় পুরো সমাজটিই নিয়ন্ত্রিত হয় তার উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা। তবে এ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ একমুখী বা একতরফা নয়। বেইজ স্ট্রাকচার কর্তৃক সুপারস্ট্রাকচার নিরূপিত হওয়ার পরে এই সুপারস্ট্রাকচারই আবার কঠিন বর্ম হয়ে দাঁড়ায় তার বেইজ স্ট্রাকচারকে রক্ষার জন্য। সুপারস্ট্রাকচার তখন বেইজ স্ট্রাকচারের পক্ষে নিয়মিত ওকালতি করে এবং বেইজ স্ট্রাকচারের পক্ষে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বুনিয়াদ গড়ে তোলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বেইজ স্ট্রাকচারের মাধ্যমে কোনো সমাজ সমাজতান্ত্রিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সেই

সমাজের সুপারস্ট্রাকচারে যে পুলিশ ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তাদের ব্রত হবে উক্ত সমাজতন্ত্রের পক্ষে কাজ করা, যে ধর্মব্যবস্থা চর্চিত হবে তার কাজ হবে উক্ত সমাজতন্ত্রের পক্ষে ফতোয়া দেয়া, যে সাহিত্য রচিত হবে তার কাজ হবে উক্ত সমাজতন্ত্রের পক্ষে তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করা। মার্কসীয় ধারণায় বেইজ ও সুপারস্ট্রাকচার এভাবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে জীবন ও জগতের পূর্ণ কাঠামোটি রচনা করে।

বেইজ ও সুপারস্ট্রাকচারের এই ধারণার মধ্যেই লুকায়িত রয়েছে সাহিত্য সম্বন্ধীয় মার্কসীয় ধারণার বীজ। বেইজ ও সুপারস্ট্রাকচারের ধারণা বলে দিচ্ছে যে, সাহিত্য সুপারস্ট্রাকচারের অংশ বিধায় কোনো সমাজের সাহিত্যের রূপ নির্ণীত হয় সেই সমাজের বেইজ স্ট্রাকচার দ্বারা। বেইজ ও সুপারস্ট্রাকচার উভয়ই উৎপাদন ব্যবস্থার তথা অর্থনৈতিক বাস্তবতার (economic conditions) দ্বিবিধ প্রকাশরূপ বিধায় বিষয়টি আরো একটু সরল করে এভাবে বলা যায় যে, মার্কসীয় ধারণামতে কোনো সমাজের সাহিত্য তার উৎপাদন ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীনরূপে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। সদর্থক বাক্যে বলা যেতে পারে, সকল সাহিত্যকর্ম আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসীয় ভাবনা এ পর্যন্ত যথেষ্ট নির্দোষ ও স্বাভাবিক। কিন্তু সে ভাবনা এ পর্যন্ত সীমায়িত থাকেনি। মার্কসীয় ভাবনামতে সুপারস্ট্রাকচার যেহেতু বেইজ স্ট্রাকচারের রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা পালন করে মর্মে ইতোমধ্যেই প্রমাণিত, সেই প্রমাণের আলোকে বলা হয় যে, সুপারস্ট্রাকচারের অংশ হিসেবে সাহিত্য কোনো সমাজের প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ব্যবস্থা তথা বেইজ স্ট্রাকচারের পক্ষে 'প্রোপাগান্ডা' হিসেবে কাজ করে। সাহিত্য প্রোপাগান্ডা হিসেবে কাজ করে সুপারস্ট্রাকচারের অন্য অংশ যেমন সরকার, প্রশাসন ও রাজনীতির পক্ষে। সাহিত্যকে এভাবে সরাসরি প্রোপাগান্ডা আখ্যা দিয়ে মার্কস সাহিত্যের প্রতি কিছুটা ঘৃণাই ব্যক্ত করলেন।

সাহিত্য সম্পর্কিত মার্কসীয় এই ভাবনা একেবারেই কাজ করে না যখন আমরা দেখি যে পৃথিবীতে অনেক সাহিত্যকর্ম আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ব্যবস্থার কিংবা শাসক শ্রেণীর পক্ষে তো বলেই না, বরং প্রতিষ্ঠিত বেইজ স্ট্রাকচার ও সুপারস্ট্রাকচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জনগণকে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখায়। আবার বেইজ স্ট্রাকচার আর সুপারস্ট্রাকচার পরস্পরের রক্ষায় নিবেদিত হয়ে মার্কসীয় ভাবনা অনুযায়ী কাজ করতে থাকলে সময়ের পরিবর্তনে কোনো একটি সমাজের বেইজ ও সুপারস্ট্রাকচারের পরিবর্তন আসাও তত্ত্বগতভাবে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাস্তবে তো আমরা দেখি ইতিহাসের একসময়কার পশুপালনভিত্তিক যাযাবর সমাজ পরিবর্তিত হয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার তারপরে শিল্পভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল ঐতিহাসিক পরিবর্তনে বেইজ ও সুপারস্ট্রাকচার সমূলেই পরিবর্তিত হয়েছে। বেইজ ও সুপারস্ট্রাকচারের এই পরিবর্তন হেগেলিয় ডায়ালেকটিকস দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলেও, সাহিত্যকর্ম কর্তৃক বেইজস্ট্রাকচারকে চ্যালেঞ্জ করার ঘটনা ব্যাখ্যার বিষয়ে মার্কসীয় সাহিত্যভাবনা বিপন্ন বোধ করে। এই বিপন্নতা থেকে মার্কসীয় সাহিত্যভাবনাকে কিছুটা উদ্ধার করেছেন মার্কসিস্ট তাত্ত্বিক রেমন্ড উইলিয়ামস (১৯২১-১৯৮৮)।

রেমন্ড উইলিয়ামস এজন্য আন্তোনিও গ্রামসির নিকট থেকে হেজিমনি (hegemony) সংক্রান্ত ধারণা ধার করেছেন। হেজিমনি হলো বিভিন্নমুখী সংস্কৃতি ও আইডিওলজির কোনো সমাজে শাসক শ্রেণি কর্তৃক চর্চিত এমন আধিপত্য যার সুবাদে শাসক শ্রেণির পছন্দের সংস্কৃতি বা আইডিওলজি সকলের নিকট পছন্দের হয়ে ওঠে। হেজিমনি ও আইডিওলজি মার্কস কথিত সুপারস্ট্রাকচারেরই অংশ। গ্রামসির হেজিমনি সংক্রান্ত ধারণাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে রেমন্ড উইলিয়ামস বললেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই বেইজ স্ট্রাকচারের ওপর দাঁড়ানো সুপারস্ট্রাকচারে হেজিমনির তিনটি রূপ থাকে- রেসিডিউয়াল হেজিমনি (residual hegemony), ডমিন্যান্ট হেজিমনি (dominant hegemony) এবং এমারজেন্ট হেজিমনি (emergent hegemony)। রেসিডিউয়াল হেজিমনি হলো ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট ধাপে যে বেইজ স্ট্রাকচারটি বিদ্যমান রয়েছে তার পূর্ববর্তী ধাপের বেইজ স্ট্রাকচারের ওপর ক্রিয়াশীল বা পূর্ববর্তী ধাপের বেইজ স্ট্রাকচার থেকে উদ্ভূত হেজিমনি যার রেশ পরের ধাপেও ক্রিয়াশীল থাকে। নিচের ডায়াগ্রামটি দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

<table>
<tr><td rowspan="2">সুপারস্ট্রাকচার</td><td>রেসিডিউয়াল হেজিমনি</td><td>ডমিন্যান্ট হেজিমনি</td><td>এমারজেন্ট হেজিমনি</td><td rowspan="2">সুপারস্ট্রাকচার</td></tr>
<tr><td colspan="3">সুপারস্ট্রাকচার</td></tr>
<tr><td>ফিউডালিজম
(বেইজ স্ট্রাকচার)</td><td colspan="3">ক্যাপিটালিজম
(বেইজ স্ট্রাকচার)</td><td>সোশালিজম
(বেইজ স্ট্রাকচার)</td></tr>
<tr><td colspan="5">ইতিহাসে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বেইজ স্ট্রাকচারের পর্যায়ক্রমিক ধাপ</td></tr>
</table>

উপরের ডায়াগ্রামে দ্বিতীয় ধাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সুপারস্ট্রাকচারে হেজিমনির তিনটি রূপ রয়েছে- রেসিডিউয়াল হেজিমনি, ডমিন্যান্ট হেজিমনি ও এমারজেন্ট হেজিমনি। মূলত দ্বিতীয় ধাপে নয়, বরং সকল ধাপেই এমন তিনটি রূপ রয়েছে। এখানে আলোচনার সুবিধার্থে শুধু একটি ধাপের উপরে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। হেজিমনির এই তিন রূপের প্রথম রূপ অর্থাৎ রেসিডিউয়াল হেজিমনি আসে পূর্ববর্তী ধাপ থেকে। উপরের ডায়াগ্রামে ক্যাপিটালিজম নামক বেইজ স্ট্রাকচারের ধাপে এই হেজিমনি এসেছে ফিউডালিজম ধাপ থেকে। ডমিন্যান্ট হেজিমনি হলো সংশ্লিষ্ট ধাপের মূল হেজিমনি বা আইডিওলজির মূল স্রোত যা শাসক শ্রেণি লালন, পরিপালন ও কার্যকর করে থাকে তাদের হাতের আইডিওলজিকাল স্টেট এ্যাপারেটাস (আইএসএ) এবং রিপ্রেসিভ স্টেট এ্যাপারেটাস (আরএসএ) দ্বারা। এমারজেন্ট হেজিমনি হলো ধীরে ধীরে ডমিন্যান্ট হেজিমনির বিরুদ্ধে জেগে ওঠা চিন্তা ও স্বর। এই হেজিমনিই মূলত সূচনা করে বিপ্লবের এবং উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে চালিত করে পরবর্তী ধাপের দিকে, অর্থাৎ ফিউডালিজমকে চালিত করে ক্যাপিটালিজমের দিকে এবং ক্যাপিটালিজমকে চালিত করে সোশালিজমের দিকে। এই এমারজেন্ট হেজিমনিই সম্ভব করে তোলে ডমিন্যান্ট হেজিমনির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের উদ্ভব। মার্কসিস্ট মতবাদের এই ব্যাখ্যা বলে দেয় কীভাবে সৃষ্টি হয় সেইসকল সাহিত্যকর্ম যারা প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ব্যবস্থার কিংবা শাসক শ্রেণীর পক্ষে তো বলেই না, বরং প্রতিষ্ঠিত বেইজ স্ট্রাকচার ও সুপারস্ট্রাকচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জনগণকে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখায়।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা সাহিত্য বিষয়ে মার্কসীয় ভাবনা সংক্রান্ত তিনটি অনুসিদ্ধান্ত টানতে পারি: ১) সাহিত্য যেহেতু চেতনা থেকে উদ্ভূত এবং চেতনা সম্পর্কে যেহেতু মার্কস বলেছেন 'মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নিরূপণ করে না, বরং তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে', সেহেতু সাহিত্য বিশ্লেষণের আবশ্যিক দায় হলো সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্ম বা আখ্যানের সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার বিচার ও বিশ্লেষণ; ২) সাহিত্য সুপারস্ট্রাকচারের অংশ বিধায় তার কাজ হলো বেইজ স্ট্রাকচারের পক্ষে ওকালতি করা বা ডমিন্যান্ট হেজিমনির প্রোপাগান্ডা হিসেবে কাজ করা; এবং ৩) এমারজেন্ট হেজিমনির প্রকাশ স্বরূপ সাহিত্যের কাজ হলো ডমিন্যান্ট হেজিমনির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বেইজ স্ট্রাকচারের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখানো। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই তিনটি অনুসিদ্ধান্তের পারস্পরিক সম্পর্ক একমুখো নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুসিদ্ধান্তের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক। একটিতে বলা হয়েছে সাহিত্যের কাজ ডমিন্যান্ট হেজিমনির পক্ষে কথা বলা, আর অপরটিতে বলা হয়েছে সাহিত্যের কাজ হলো ডমিন্যান্ট হেজিমনির বিরুদ্ধে কথা বলা। আবার প্রথম অনুসিদ্ধান্তের সাথে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অনুসিদ্ধান্তের সম্পর্কও দ্বিমুখো। প্রথম অনুসিদ্ধান্ত অনুসারে মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুসিদ্ধান্ত অনুসারে মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যকর্মের উদ্ভব ও সৃজনের সাথে সম্পর্কিত।

প্রথম অনুসিদ্ধান্ত অনুযায়ী মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের যা কাজ সে বিষয়ে মার্কসিস্টদের মধ্যে মতভেদ বিরল। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুসিদ্ধান্ত অনুসারে সাহিত্য সম্পর্কিত ভাবনায় মার্কসিস্টদের মধ্যেই প্রবল মতভেদ বা মতদ্বৈততা বিদ্যমান। সাহিত্যকে প্রোপাগান্ডা আখ্যা দিয়ে মার্কস নিজেই সাহিত্যকে প্লেটোর মতো অনেকটা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন। মার্কসের এই নেতিবাচক মনোভঙ্গি অনুসরণ করে অনেক মার্কসিস্টই সাহিত্যকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ত্যাজ্য হিসেবে দেখেছেন, বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যকে যেখানে তন্ময়তার (objectivity) চেয়ে মন্ময়তার (subjectivity) জোর অনেক বেশি। লেনিন নিজেই এই ভাবনার একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। এই ভাবনার অনুবর্তী হয়েই ১৯৩৪ সালে রাশিয়ার লেখক কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের বিচারে জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাসের স্বরূপ হলো 'পোকায় কিলবিল করা কতখানি গোবর' (a heap of dung crawling with worms)। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক কার্ল রাডেক (Karl Radek) বলেছিলেন- 'জয়েসের জগৎ অবস্থিত একটি মধ্যযুগীয় বইয়ে ঠাসা আলমারি, একটি বেশ্যালয় এবং একটি মদের দোকানের মাঝখানে'।

তবে এই গোঁড়া মতের সমর্থকরাই আবার সাহিত্যের জয়ধ্বনি গাইতে চাইলেন যদি সে সাহিত্য হয় সোশালিজম বা কম্যুনিজমের প্রোপাগান্ডা, যদি সে সাহিত্য তুলে ধরে শ্রেণিসংগ্রামের বয়ান আর যদি তাতে থাকে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে লেখকের শক্ত অবস্থান। লেনিন খুব রাখঢাক ছাড়াই ১৯০৫ সালে বললেন 'সাহিত্যকে হতে হবে পার্টির হাতিয়ার'। সাহিত্যকে হতে হবে পার্টি-আচরিত শ্রমিকশ্রেণির কল্যাণে আত্মনিবেদিত। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরে শিল্পসাহিত্য বিষয়ে বিপ্লবীরা তাঁদের নতুন নীতির নাম দিলেন 'নারদনস্ত' (narodnost)। এ নীতি অনুযায়ী শিল্পকে হতে হবে 'জনতার আর্ট'। যে কোনো শিল্প বা সাহিত্যকর্মকে তার যুগের মেহনতি জনতার কাছে বোধগম্য ও উপভোগ্য হতে হবে, তাতে থাকতে হবে সমাজচেতনার সংহত রূপ এবং বর্তমানের নিরিখে ভবিষ্যতের সমাজবিকাশের সম্ভাবনাকে দেখার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। সহজ কথায় তাকে হতে হবে সোশালিজমের প্রোপাগান্ডা। ব্যাপারটাকে সরলীকরণ করলে এই দাঁড়ায় যে, বেইজ স্ট্রাকচার যদি ফিউডালিজমের হয়, আর তখন যদি ফিউডালিজমের পক্ষের আইডিওলজি বা ডমিন্যান্ট হেজিমনি ধারণ করে সাহিত্য রচিত হয়, তাহলে লেনিনপন্থী মার্কসিস্টদের আপত্তি আছে; একইভাবে বেইজ স্ট্রাকচার যদি ক্যাপিটালিজমের হয়, আর তখন যদি ক্যাপিটালিজমের পক্ষের আইডিওলজি বা ডমিন্যান্ট হেজিমনি ধারণ করে সাহিত্য রচিত হয়, তাহলে লেনিনপন্থী মার্কসিস্টদের আপত্তি আছে; কিন্তু বেইজ স্ট্রাকচার যদি সোশালিজমের হয়, আর তখন যদি সোশালিজমের পক্ষের আইডিওলজি বা ডমিন্যান্ট হেজিমনি ধারণ করে সাহিত্য রচিত হয়, তাহলে আর লেনিনপন্থী মার্কসিস্টদের আপত্তি তো নাই-ই, বরং তাঁরা তখন জোর গলায় 'মারহাবা, মারহাবা' বলে লেখককে সাধুবাদ জানাতে আগ্রহী।

এঙ্গেলস অবশ্য মার্কসের মতো মনে করতেন না যে, সাহিত্য প্রোপাগান্ডা গোছের কিছু। ১৮৯০ সালের লেখা পত্রাবলিতে এঙ্গেলস বলেছেন- যদিও তিনি মনে করেন যে, জীবনের অর্থনৈতিক দিক অন্য সকল দিককে নিয়ন্ত্রণ করে, তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন

যে, আর্ট, দর্শন এবং চেতনার অন্যান্য আঙ্গিক তুলনামূলক স্বাধীনভাবে কার্যক্ষম এবং মানুষের চেতনা পাল্টে দেয়ার শক্তি তাদের রয়েছে। এঙ্গেলস এভাবে বললেও তা একধরনের আকস্মিক বলা এবং তাদের তত্ত্বের সাথে এই বলা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই ভিন্নরূপ বক্তব্যকে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করার কোনো চেষ্টাও তিনি করেননি। কিন্তু এই বক্তব্য তত্ত্বভুক্ত করা প্রয়োজন মর্মে মার্কসিস্টরা অনুভব করতে লাগলেন। নচেৎ মার্কসিস্টদের পক্ষ থেকে সাহিত্য বিষয়ে লেনিনের মতো গোঁড়া অভিমত আরো বেশি মাত্রায় উচ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিলো। এই উদারপন্থী এঙ্গেলসীয় অভিমতই রেমন্ড উইলিয়ামসের এমারজেন্ট হেজিমনি নামক ধারণা দ্বারা তাত্ত্বিকভাবে বৈধতা পেলো। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বেইজ স্ট্রাকচারের প্রতি ধাপেই সুপারস্ট্রাকচারে ডমিন্যান্ট হেজিমনির বিরুদ্ধে একটি বিপরীত শক্তিস্রোত তৈরি হয় যা এমারজেন্ট হেজিমনি রূপে বেইজ স্ট্রাকচারকে পরবর্তী ধাপের দিকে চালিত করে, অর্থাৎ সোশালিজমের পথে বিপ্লবকে ক্রিয়াশীল রাখে। একথার মধ্যে সাহিত্য দ্বারা চেতনার পরিবর্তন সম্ভব মর্মে এঙ্গেলসের প্রদত্ত অভিমতের অনুরণন আছে। উইলিয়ামসের এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে একথা বলা সহজ হলো যে, বেইজ স্ট্রাকচারের প্রতিধাপের সাহিত্যই মার্কসিস্টদের কাছে মূল্যবান। কারণ, তাঁরা অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন যে, ট্রাইবালিজম, ফিউডালিজম, ক্যাপটিালিজম- বেইজ স্ট্রাকচারের ইত্যাকার প্রতি ধাপেই তাদের সুপারস্ট্রাকচারে সাহিত্যের মাঝে রয়েছে এমারজেন্ট হেজিমনির প্রভাব ও উচ্চারণ, আর তার ফলস্বরূপ রয়েছে সংশ্লিষ্ট বেইজ স্ট্রাকচারকে অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন। তবে উইলিয়ামসের এই তত্ত্বের পরেও ফিউডালিজম ও ক্যাপিটালিজমের সময়কার ডমিন্যান্ট হেজিমনি বা ডমিন্যান্ট আইডিওলজি দ্বারা অনুপ্রাণিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে মার্কসিস্টদের অবস্থান পূর্ববৎ কঠোর ও কট্টরই থেকে যায়।

সাহিত্য সম্বন্ধে মার্কসিস্ট ভাবনার এই সকল বিষয়কে একত্র করে মার্কসিস্ট সাহিত্য সমালোচনায় কী কী কাজ করা হয় তার একটি নিম্নরূপ তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

ক) সাহিত্যকর্মটিতে যে সমাজ ধৃত আছে তার বেইজ স্ট্রাকচার তথা উৎপাদন কাঠামোটি কেমন তার স্বরূপ অন্বেষণ করা।

খ) সমাজের উৎপাদন কাঠামোতে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন স্তরের জনতার মাঝে সম্পর্ক কেমন তথা শ্রেণি-সংগ্রামের চিত্রটি কেমন তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা।

গ) সাহিত্যকর্মটিতে ধৃত উৎপাদন কাঠামোর ভিত্তিতে সমাজটি যদি ফিউডালিস্ট, ক্যাপিটালিস্ট, ইমপেরিয়ালিস্ট ইত্যাদি হয় তাহলে বিশ্লেষণ করে দেখা যে, ডমিন্যান্ট হেজিমনির সমর্থনে সাহিত্যকর্মটি ফিউডালিজম, ক্যাপিটালিজম ইত্যাদির পক্ষে বলছে কিনা। যদি পক্ষে বলে তাহলে সাহিত্যকর্মটিকে বিচারের মাধ্যমে তুলোধুনো করা।

গ) ডমিন্যান্ট হেজিমনির সমর্থনে সাহিত্যকর্মটি ফিউডালিজম, ক্যাপিটালিজম ইত্যাদির পক্ষে না বলে যদি এমারজেন্ট হেজিমনি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যকর্মটি নিপীড়নমূলক আইডিওলজির বিপক্ষে বলে, যদি সাহিত্যকর্মটি ধরিয়ে দেয় কীভাবে আইডওলজি ও হেজিমনির চিনির প্রলেপযুক্ত তিতা বড়ি খাইয়ে শাসক শ্রেণি শোষণ-নিপীড়নকে জায়েজ করে নিচ্ছে, তাহলে মার্কসিস্ট সমালোচকের কাজ হলো সাহিত্যকর্মটি পরতে পরতে খুলে দেখিয়ে দেয়া যে কী শক্তিশালীভাবে এটি নিপীড়িতের ও শোষিতের পক্ষে কথা বলছে এবং এসব দেখিয়ে দেয়ার সাথে সাথে সাহিত্যকর্মটির ভূয়সী প্রশংসা করা।

ঘ) সাহিত্যকর্মটিতে ডমিন্যান্ট হেজিমনি এবং এমারজেন্ট হেজিমনি উভয়ের পক্ষেই যদি বক্তব্য পাওয়া যায় তাহলে মার্কসিস্ট সমালোচকের কাজ হলো দেখিয়ে দেয়া সাহিত্যকর্মটি আইডিওলজিগতভাবে কতটা পরস্পরবিরোধী বা সাঘর্ষিক।

ঙ) সাহিত্যকর্মটিতে ধর্ম কীভাবে চিত্রিত হয়েছে সেটিও মার্কসিস্টদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহের বিষয়। ধর্ম বিষয়ে মার্কসিস্ট সমালোচকদের তিনটি কাজ: (১) সাহিত্যকর্মটিতে আর্থসামাজিক নিপীড়ন ও শোষণের বাস্তবতায় ধর্ম শাসক শ্রেণির পক্ষে ব্যবহৃত হলে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও ধর্মকে এভাবে ব্যবহারের কাজটিকে নিন্দা করা; (২) ধর্মকে আইডিওলজির অংশ রূপে শাসকগোষ্ঠির নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে দেখানো হলে লেখক কীভাবে তেমনটা দেখিয়েছেন তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা; এবং (৩) সাহিত্যকর্মটির লেখক কর্তৃক ধর্মকে এভাবে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে দেখানোর কাজটিকে ভূয়সী প্রশংসা করা।

মার্কসবাদ একটি গ্রান্ড ন্যারেটিভ যা দ্বারা জীবন ও জগতের সবকিছু ব্যাখ্যা করা হয়। সে প্রেক্ষিতে সাহিত্য বিষয়ে মার্কসবাদের বয়ান এবং ব্যাখ্যাও বিশাল ও ব্যাপক। সেই ব্যাপকতার কিঞ্চিৎমাত্র এখানে এতক্ষণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যা দ্বারা মার্কসবাদী সাহিত্যসমালোচনার একটি সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক ধারণা প্রদানই ছিল লক্ষ্য। এই সংক্ষেপণের ফলে অনেক মার্কসবাদী ধারণাকে অতি সরলীকরণ ও অতি সার্বিকীকরণ করা হয়েছে যা মার্কসবাদী অনেকের কাছে হয়তো আপত্তিকরই মনে হবে। তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আমরা সাহিত্যতত্ত্বের এ আলোচনার পরবর্তী ধাপে উপস্থাপন করতে চাই মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব বা সাইকোএ্যানালিটিকাল থিয়রি।

সাইকোএ্যানালিটিকাল ক্রিটিকাল থিয়রি বা মনঃসমীক্ষণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব

সাহিত্য সমালেচানায় সাইকোএ্যানালাইসিস বা মনঃসমীক্ষণবাদী তত্ত্ব বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দুনিয়া জুড়ে এক তোলপাড় কাণ্ড ঘটিয়েছে। সাইকোএ্যানালাইসিস মূলত হলো মনোরোগ চিকিৎসার একটি ডাক্তারি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাথে জড়িত কিছু বিষয় ও ভাবনা পরবর্তী সময়ে শুধু সাহিত্য নয় বরং জীবনের সবকিছুর ব্যাখ্যায় পারঙ্গমতা দেখাতে শুরু করলো। কালে সেই পারঙ্গমতার মধ্য

দিয়ে সাইকোএ্যানালাইসিস হয়ে উঠলো জীবন ও জগৎকে ব্যাখ্যার এক জবরদস্ত তত্ত্ব। এই তত্ত্বের আদিমূলে রয়েছে জার্মান (ভাষাগতভাবে) মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) এক লজ্জাকর আপ্তবাক্য। ফ্রয়েড অনেক মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করে শেষে মানবজাতির মুখে চুনকালি মেখে ঘোষণা করলেন যে, মানুষের মনোজগৎ পুরোটা নিয়ন্ত্রিত হয় তার যৌনাকাঙ্ক্ষা দ্বারা। আর মানুষের বহির্জগতের সবকিছু যেহেতু মন বা মানসিক ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেহেতু মানবজগতের সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় তার যৌনাকাঙ্ক্ষা দ্বারাই। সেই সবকিছুর মধ্য থেকে সাহিত্য যেহেতু বাদ যায় না সেহেতু তাঁর তত্ত্বমতে সাহিত্য-শিল্পও মূলে বিভিন্নরূপে যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশেরই ফসল। আমরা আগের নিবন্ধে দেখেছি কীভাবে এক জার্মান পণ্ডিত দুনিয়ার সবকিছু অর্থনীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, এবার দেখবো আরেক জার্মান পণ্ডিত কীভাবে দুনিয়ার সবকিছু যৌনাকাঙ্ক্ষা দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।

এই ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে আমাদের একটু প্রস্তুতির বিষয় আছে। আমাদেরকে এই সাইকোএ্যানালাইসিস নামক মনোচিকিৎসার সাথে সম্পর্কিত এবং সাইকোএ্যানালাইটিক তত্ত্বের সাথে বহুলভাবে আলোচিত কতিপয় পারিভাষিক শব্দ বা টেকনিকাল টার্ম সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। শব্দগুলোকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করলে ব্যাপারটা একটু সহজ হতে পারে। ক্ষেত্রগুলো হলো যৌনতার বিকাশ, মনের মানচিত্র ও মনের কার্যাবলী, স্বপ্নজগৎ ও লেখক মানস। এই ক্ষেত্রগুলো নিয়ে ফ্রয়েড কোনো ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন ব্যাপারটা এমন নয়। তিনি মনের চিকিৎসক মানুষ। মনোরোগীদের ওপর তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার বয়ান নিয়ে তিনি বিস্তর কিতাবাদি লিখেছেন। সেসব কিতাবাদিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গসূত্রে তিনি এসব বিষয়ের ওপর কথা বলেছেন। পরে সাহিত্যতাত্ত্বিকরা তাদের মনঃসমীক্ষণবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেগুলো একত্রে গ্রন্থনার চেষ্টা করেছেন। এখন মনঃসমীক্ষণবাদী তত্ত্বের আলোচনায় তাই আমাদেরকেও প্রথমে সেগুলোকে বুঝে নিতে হয়।

যৌনতার বিকাশ: ফ্রয়েডের তত্ত্বমতে মানুষের যৌনচেতনা বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু হয় না, বরং তা শুরু হয় শিশুর জন্ম থেকেই। শিশুকাল থেকে জন্ম নেয়া এই যৌনচেতনার ফ্রয়েডিয় নাম **লিবিডো** বা যৌনাকাঙ্ক্ষা। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেকের জীবনে লিবিডোর বা যৌনতার পাঁচটি স্টেজ বা স্তর রয়েছে: **ওরাল স্টেজ** (oral stage), **এ্যানাল স্টেজ** (anal stage), **ফ্যালিক স্টেজ** (phallic stage), লেটেন্ট স্টেজ (latent stage) ও জেনিটাল স্টেজ (genital stage)। আমাদের আলোচ্য থিয়রিরর জন্য প্রথম তিনটি স্টেজ সম্পর্কিত ধারণা আমদের স্পষ্ট হওয়া দরকার। **ওরাল স্টেজে** শিশু প্রথমে মায়ের স্তনবৃন্ত এবং পরে যা কিছু হাতের কাছে পায় তা মুখে নিয়ে আনন্দ অনুভব করে। ফ্রয়েড এটিকে যৌন আনন্দ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন এবং এই স্টেজের মোটামুটি সময়কাল হলো শিশুর জন্মের পর থেকে একবছর। এরপরে **এ্যানাল স্টেজে** শিশু মলত্যাগে বিশেষ আনন্দ পায় এবং ফ্রয়েডের মতে এটিও একধরনের যৌনানন্দ। এই স্টেজের মোটামুটি সময়কাল হলো শিশুর বয়সের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর। শিশুর যৌনতা বিকাশের তৃতীয় স্তর হলো ফ্যালিক স্টেজ অর্থাৎ লিঙ্গভিত্তিক যৌনান্দের স্তর। এর সময়কাল মোটামুটি চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ বছর। এটাই মূলত যৌনতার স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃত স্তর।

ফ্যালিক স্টেজে শিশুর লিবিডোর প্রথম লক্ষ্য হলো তার মা। এই লক্ষ্য অর্জনের পথে বিশেষ করে ছেলে শিশুরা প্রথম বাঁধা বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে পায় তার বাবাকে। সে তাই বাবাকে হত্যার এক গোপন ইচ্ছা ভিতরে লালন করতে শুরু করে। এই বিষয়টিকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন **ইডিপাস কমপ্লেক্স** (Oedipus complex)। নামটি ইডিপাস বিষয়ক মিথ থেকে আনা হয়েছে কারণ আমরা জানি সে মিথে ইডিপাস তার বাবা লেয়াসকে হত্যা করেছিল এবং তার মাকে বিয়ে করেছিল। এই কমপ্লেক্সে ছেলে শিশুটি একটু বড় হয়ে যখন বুঝতে পারে যে, তার বাবা তার চেয়ে শক্তিশালী তখন সে একটি আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যায়। শিশুটির মনে হয় তার বাবা তাকে নপুংসক করে ফেলবে। ফ্রয়েড এই আতঙ্কের নাম দিয়েছেন **ক্যাস্ট্রেশন কমপ্লেক্স** (castration complex)। ছেলেটি বড় হয়ে উঠতে উঠতে তার সমাজবাস্তবতায় অনুভব করতে শুরু করে যে, বাবাকে হত্যার ইচ্ছার বিষয়টি বেশ নোংরা এবং সামাজিকভাবে মারাত্মক এক ট্যাবু। ফলে মায়ের প্রতি যৌনাকাঙ্ক্ষামূলক ভালোবাসার ইচ্ছা, বাবাকে হত্যার ইচ্ছা ইত্যাদি সে সচেতনভাবে মনের ভিতরে চাপা দিতে বা গোপন করতে চেষ্টা করে। ফ্রয়েড মনের ইচ্ছাকে এভাবে গোপন করার বা চাপা দেয়ার কাজকে বলেছেন **রিপ্রেশন** (Repression) বা অবদমন। ফ্রয়েডের মতে মানুষের সবরকম মনোরোগের কারণ হলো এই **রিপ্রেশন** বা অবদমন। শিশু তার বাবাকে হত্যার ইচ্ছাটি বা মায়ের প্রতি যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ইচ্ছাটি অবদমিত করার পরে ইচ্ছাটি তার মনের অচেতন অংশে চলে যায় এবং সেখানে জমা হয়। সচেতনভাবে সে বরং এবার চেষ্টা করে বাবার মতো হতে যাতে মায়ের মতো একজনের সম্পূর্ণ ভালোবাসা সে পেতে পারে যেভাবে তার বাবা পাচ্ছে। এ পর্যায়ে সে *মায়ের মতো* একজনের ভালোবাসা পেতে চেষ্টা করে। *মায়ের মতো* বলা হচ্ছে এ কারণে যে, মায়ের প্রতি যৌনাকাঙ্ক্ষামূলক ভালোবাসার প্রকাশ (ফ্রয়েডের মতে সব ভালোবাসাই যৌনাকাঙ্ক্ষামূলক) মারাত্মক ট্যাবু বিধায় এটি সচেতনভাবেই সে পরিহার করে এবং মায়ের পরিবর্তে *মায়ের মতো* কাউকে সে জায়গায় স্থাপন করাটা বাস্তবসম্মত বলে তার মনে হয়। সাইকোএ্যানালাইটিক থিয়রির ধারণায় এ থেকে জন্ম নেয় **মাদার ফিক্সেশন** (Mother fixation)।

মনের মানচিত্র ও মনের কার্যাবলী: ফ্রয়েড মানুষের মনের একখানা মানচিত্র আঁকার জন্য অনেক কসরত করেছেন। মানচিত্রখানা অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছেন। শেষ পর্যন্ত মোটামুটি সহজ একখানা মানচিত্রই আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। সে মানচিত্র মোতাবেক মনের দুটি অংশ রয়েছে: একটি সচেতন অংশ (the conscious mind) ও আরেকটি অচেতন অংশ (the unconscious mind)। প্রিকনশাস মাইন্ড (preconscious mind) নামে আরো একটি অংশের কথা ফ্রয়েড মাঝে মাঝে বলেছেন তবে সেটি সাইকোএ্যানালাইটিক থিয়রির জন্য খুব প্রয়োজনীয় ধারণা নয়। আয়তনে অচেতন অংশ সচেতন অংশের চেয়ে অনেক বড় যেমন সাগরে ভাসমান হিমবাহের ভাসমান অংশের তুলনায় ডুবন্ত অংশের আয়তন অনেকগুণ বড়। এই দুই অংশের

কার্যাবলীকে ফ্রয়েড তিন ভাগে ভাগ করেছেন: **ইদ** (id), **ইগো** (ego) ও **সুপার ইগো** (super ego)। আগেই বলা হয়েছে ফ্রয়েডের মতে মানুষের সকল ইচ্ছা যৌনতা বা লিবিডো নিয়ন্ত্রিত। লিবিডো বা যৌনতার সকল আকাঙ্ক্ষার সম্মিলিত নাম ইদ। মানুষের সকল অবারিত আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই ইদ নির্মিত। কিন্তু শিশু বড় হতে হতে বুঝতে পারে যে, বাস্তব জগতে এই সকল আকাঙ্ক্ষার অনেক কিছুই নৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় পূরণীয় নয়। তখন সে সমাজবাস্তবতা ও তার ইদ-ভিত্তিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি সমঝোতা বিধানের চেষ্টা করে, একটি মধ্যবর্তী গ্রহণযোগ্য জায়গায় পৌঁছতে চেষ্টা করে। সমঝোতার মাধ্যমে অর্জিত এই মধ্যবর্তী জায়গাটিই হলো **ইগো**। ইগোতে পৌঁছতে হলে ইদকে মনের সচেতন অংশ থেকে সরাতে হয়। এই সরানোর অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে যেমন রিপ্রেশন (repression), ডিসপ্লেসমেন্ট (displacement), ডিনায়াল (denial), প্রোজেকশন (projection) ও রিগ্রেশন (regression)। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রক্রিয়া হলো রিপ্রেশন। এই রিপ্রেশন প্রক্রিয়ায় সকল অবদমিত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা মনের সচেতন অংশ থেকে সরে গিয়ে অচেতন অংশে জমা হয়। সারা জীবন ধরে জমতে জমতে অচেতন অংশে অবদিমত আকাঙ্ক্ষাদের পাহাড় তৈরি হতে থাকে। ইগোর কাজ হলো সমাজবাস্তবতা ও নীতি নৈতিকতার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা আর **সুপারইগো**র কাজ হলো নৈতিকতার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে সমাজবাস্তবতার সকল নৈতিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সে অনুযায়ী নিজের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের মানসিক প্রয়াস। শিশুর কাছে এই বিধিনিষেধ প্রথম আসে তার বাবার কাছ থেকে। পরবর্তীতে এই বাবার স্থানেই চলে আসেন ঈশ্বর যিনি মানবজাতির সকল বিধিনিষেধের সর্বোচ্চ উৎস। সুপারইগোর সকল কাজকর্মে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের মতো পুতপবিত্র একজন হলেন মানুষের পথনির্দেশক।

স্বপ্নজগৎ: ফ্রয়েডের মতে মনের অচেতন অংশে আটকে থাকা ইদ বা অবদমিত আকাঙ্ক্ষারা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। মনের অচেতন অংশ থেকে মানুষের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাদের বেরিয়ে আসার সাধারণ পথ হলো স্বপ্ন। তাই স্বপ্ন ফ্রয়েডের সাইকোএ্যানালিটিকাল কর্মকাণ্ডের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। অচেতনের কোনটুকু কীভাবে স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করেছে তা দেখানোর চেষ্টাকে ফ্রয়েড বলেছেন **ড্রিমওয়ার্ক**। সনাতন খোয়াবনামায় স্বপ্নের ব্যাখ্যায় একটি অর্থে পৌঁছার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ড্রিমওয়ার্কে স্বপ্নের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। বরং মানুষের ও স্থানের ভিন্নতায় ড্রিমওয়ার্কাররা একই স্বপ্নের বিভিন্ন বিপরীতমুখী অর্থের ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন। ড্রিমওয়ার্কে দুধরনের কাজ থাকে: **কনডেনসেশন** (condensation) ও **ডিসপ্লেসমেন্ট** (displacement)। স্বপ্নের মধ্যে অচেতনের বিষয়াবলি সরাসরি প্রকাশিত হয় না। স্বপ্নের মধ্যে ঘটনার বহুবিধতা অন্তর্নিহিত বা অচেতনের বিষয়াবলির সহজ প্রকাশকে ঘোলাটে ও কঠিন করে দেয়। **কনডেনসেশন** হলো স্বপ্নের সেই বহুবিধতার মধ্যে একটি কেন্দ্রিক ইমেজ খুঁজে বের করা যার মধ্য দিয়ে অচেতনের বিষয়টিকে দেখা যায়। স্বপ্নের দৃশ্যমান বিষয়াবলি দ্বারা অচেতনের যে অদৃশ্য বিষয়াবলি বোঝানো হয় তাদের মধ্যে সম্পর্ক এতই দূরের হয় যে অনেক সময় তা বলতে গেলে কৌতুকের মতো শোনায়। **স্বপ্নের** দৃশ্যমান বিষয়গুলো থেকে স্বপ্নের ঈপ্সিত অর্থের এমন দূরে সরে যাওয়াকে ফ্রয়েড **ডিসপ্লেসমেন্ট** বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ফ্রয়েডের মতে মনের অচেতনের বিষয়াদি শুধু ঘুমের ভিতরে দেখা স্বপ্নের মধ্য দিয়েই বের হয়ে আসে না। মানুষের জাগ্রত অবস্থায়ও কিছু পথে এদের বের হয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। এমন একটি পথের নাম **প্যারাপ্রাক্সিস** (parapraxis)। 'দি সাইকোপ্যাথলজি অব এভরিডে লাইফ' গ্রন্থে ফ্রয়েড বলেন যে, মনের অচেতন অংশের প্রকাশ শুধু স্বপ্নে নয়; আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের যে কাজগুলোকে আমরা 'ভুল' বলে মনে করে থাকি সেগুলোও মূলত আমাদের মনের অচেতন অংশে জমে থাকা বিষয়াবলীর প্রকাশ। এই সব ভুলের মধ্যে রয়েছে যেমন নাম ভুলে যাওয়া, জানা শব্দের ভুল উচ্চারণ করা, জানা সত্ত্বেও ঠিক শব্দের জায়গায় বেঠিক শব্দ ব্যবহার করা ইত্যাদি। মনের অচেতন অংশ থেকে বের হয়ে আসা এই জাতীয় ভুলগুলোকে ফ্রয়েড বলেছেন **প্যারাপ্রাক্সিস**। ফ্রয়েড বলছেন যে, এগুলো আমাদের মনের অচেতন অংশে জমে থাকা অবদমিত আকাঙ্ক্ষা এবং স্মৃতির জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশিত রূপ। মনের সচেতন অংশ এগুলোকে ছিপিবদ্ধ করে আটকে রাখতে চায়। যখন পারে না তখন এরা এভাবে বের হয়ে আসে আর এগুলোকে তখন আমরা 'ভুল' বলে বাতিল করে রাখি।

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এবং দৈনন্দিন ভুলের মধ্য দিয়ে অবদমিত ইদের প্রকাশ হয় বিধায় মনোরোগের চিকিৎসকরা সেই স্বপ্নগুলো বা ভুলগুলো বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন তার রোগীটি ইদ-বিষয়ক কী ঘটনা বা কী বাসনা অবদমন করতে করতে মানসিক রোগীতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সাইকোএ্যানালাইসিস নামক মনোচিকিৎসায় ডাক্তারের কাছে রোগীর 'স্বপ্ন' এবং 'ভুল' হলো রোগের সঠিক ডায়াগনসিসের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ দুই উপাদান। এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার যেমন রোগীর রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করে থাকেন, সাইকোএ্যানালাইসিস নামক মনোচিকিৎসায় সাইকিয়াট্রিস্টও তেমনি রোগীর 'স্বপ্ন' আর 'ভুল' পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করে তাঁর রোগীর রোগের কারণ বের করে থাকেন। কিন্তু সমস্যা হলো এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার চাইলেই রোগী রক্ত আর প্রস্রাব দিয়ে দিতে পারে পরীক্ষার জন্য, কিন্তু মনোচিকিৎসক চাইলেই মনোরোগী স্বপ্ন দেখতে বসতে পারে না কিংবা ভুল করে সে ভুল চিকিৎসকের হাতে পীক্ষার জন্য তুলে দিতে পারে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রয়েড **ফ্রি এ্যাসোসিয়েশন** নামে একটি টেকনিক আবিষ্কার করলেন যার মাধ্যমে চিকিৎসক রোগীকে কথা বলাতে বলাতে তার সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে তার মনের অচেতন অংশে প্রবেশ করতে পারেন।

লেখক মানস: সাইকোএ্যানালাইটিক তত্ত্বমতে লেখক বা সৃষ্টিশীল মানুষদের মনের অচেতন অংশে আটকে থাকা 'ইদ' একটু ভিন্ন কিছু উপায়ে বের হয়ে আসে। এক্ষেত্রে তিনটি পরিচিত উপায় হলো **ফ্যান্টাসি** (phantasy), **ডে-ড্রিমিং** (day-dreaming) ও **সাবলিমেশন** (sublimation)। তিনটিই বেশ পরোক্ষ উপায়। ফ্যান্টাসি হলো কল্পনায় কোনো ঘটনা সৃষ্টি করে তা থেকে আনন্দ

পাওয়ার প্রয়াস। যে যৌনাকাঙ্ক্ষা বাস্তবসম্মত নয় তেমন যৌনাকাঙ্ক্ষা মনের অজান্তে লালন করে কল্পনায় তা চরিতার্থ করা সম্ভব হয় ফ্যান্টাসির মাধ্যমে। এতে আকাঙ্ক্ষাও কিছুটা চরিতার্থ হয়, আবার অনৈতিকতার কালিমা থেকেও মুক্ত থাকা যায়। ফ্যান্টাসির আরেকটু ঘনীভূত রূপ হলো **ডে-ড্রিমিং** বা দিবাস্বপ্ন। দিবাস্বপ্নের বিষয়টি লেখকের চেয়ে বরং সাধারণ মানুষের চর্চায় বেশি থাকে। সাধারণ মানুষেরা তাদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাগুলোকে দিবাস্বপ্নের মতো অলীক কল্পনায় পূরণ হতে দিয়ে তার মধ্যে একটু আনন্দ খুঁজে পায়। **সাবলিমেশন** অবদমিত ইদ প্রকাশের আরো একধাপ মহৎ ও লেখক-সুলভ এক প্রক্রিয়া। সাবলিমেশনের মাধ্যমে অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে অন্যরূপে মহিমান্বিত করে প্রকাশের প্রয়াস থাকে; যেমন, কামজ ও দৈহিক প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে ঈশ্বরের প্রতি বা ঈশ্বর রূপ দেবীর প্রতি তীব্র প্রেমের প্রকাশরূপে অভিব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার **সাবলিমেশন** ঘটে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাইকোএ্যানালাইসিসের সাথে সম্পর্কিত উপরোক্ত টেকনিকাল টার্মগুলো বা শব্দগুলো সব হয়তো সাইকোএ্যানালিটিকাল সমালোচনাতত্ত্ব বুঝতে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবুও সাইকোএ্যানালিটিকাল সমালোচনাতত্ত্বের আলোচনায় সাধারণত এই শব্দগুলো চলে আসে। এবারে আমরা এই শব্দগুলোর সাহায্য নিয়ে সাইকোএ্যানালিটিকাল সমালোচনাতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

ফ্রয়েডীয় সাইকোএ্যানালিটিকাল সমালোচনাতত্ত্ব বলতে চায় যে, সাহিত্য মূলত মানুষের মনের অচেতন অংশে আটকে থাকা অবদমিত লিবিডো বা ইদের এক শৈল্পিক প্রকাশ। বিশেষ করে ফিকশনাল সাহিত্যে অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদিতে এই ইদ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের চরিত্রদের আচরণ বিশ্লেষণ করলে সেখানে এই ইদ কখনো **ইডিপাস কমপ্লেক্স** রূপে, কখনো **মাদার ফিক্সেশন** রূপে আবার কখনো **ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স** রূপে খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসের চরিত্রের **ফ্যান্টাসি**, **প্যারাপ্রাক্সিস** ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যৌনাকাঙ্ক্ষা অবদমনের কী ধরনের ছায়াপাত তার চরিত্রে স্থায়ী হয়ে আছে। চরিত্রের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে বুঝে নেয়া যায় ইদ, ইগো ও সুপারইগোর মধ্যে কার বলয়ে চরিত্রটি বিকাশ লাভের চেষ্টা করছে। কবিতার ইমেজ বিশ্লেষণ করে দেখে নেয়া যায় কবির মনোজগতে ইদ কীভাবে **সাবলিমেশন** রূপে উত্তীর্ণ হচ্ছে। আবার সাহিত্যকর্মটির চরিত্র কিংবা চিত্রকল্প বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তীর্যক চাহনিতে দেখে নেয়া যায় লেখকের মনের গঠনটি কেমন। দেখে নেয়া যায় লেখকের মনের অবদমিত ইদের আয়তন কী এবং প্রকরণ কী। সাইকোএ্যানালিটিকাল সমালোচনাতত্ত্ব মতে লেখকের নিজের মনের চিত্রই মূলত তাঁর লেখার চরিত্র ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়। তাই সাইকোএ্যানালিটিকাল সমালোচনাতত্ত্ব মূলত এক লেখক-কেন্দ্রিক তত্ত্ব। এমনকি, চরিত্র বিশ্লেষণের সময় এ-ও ভেবে দেখা হয় যে, লেখক তাঁর চরিত্রদের ওপর মনোচিকিৎসকের মতো কতটা দক্ষতার সাথে ফ্রি-এ্যাসোসিয়েশন টেকনিক প্রয়োগ কতে পেরেছেন। লেখক-কেন্দ্রিক এই তত্ত্বে সমাজ বড় নয়, ব্যক্তি বড়; মানুষ বড় নয়, মন বড়। সাইকোএ্যানালিটিকাল সমালোচনাতত্ত্ব অনুযায়ী একজন সমালোচকের কর্ম ও ভাবনা কী কী তার একটি ছোট তালিকা প্রদান করা যেতে পারে।

ক) এই তত্ত্ব অনুযায়ী একজন সমালোচক চরিত্রদের কর্মকাণ্ডগুলোকে দুইভাগে ভাগ করে দেখানোর চেষ্টা করেন কোনগুলো অচেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কোনগুলো সচেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরপরে আরো দেখাতে চেষ্টা করেন কীভাবে পুরো কর্মকাণ্ড জুড়ে অচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দেখাতে চেষ্টা করেন কীভাবে সাহিত্যকর্মটির মূল বক্তব্য মনের ঐ অচেতন অংশের তথা অবদমিত ইদের কর্মকাণ্ডের সাথেই মূলত সম্পৃক্ত।

খ) সমালোচক সাহিত্যকর্মটির সারা টেক্সট আতিপাতি করে খুঁজে খুঁজে দেখান এর অভ্যন্তরস্থ সাইকোএ্যানালিটিক লক্ষ্মণাদি যেমন: ইডিপাস কমপ্লেক্স, ফাদার অথবা মাদার ফিক্সেশনের চিত্র, ফ্যালিক ও জেনিটাল স্টেজের যৌনতা বিকাশের চিত্র, অবদমনের চিত্র, অবদমন থেকে উদ্ভূত নিউরোসিস, ফ্যান্টাসি বা সাবলিমেশনের চিত্র, প্যারাপ্রাক্সিসের উদাহরণ ইত্যাদি।

গ) শুধু একটি বিশেষ সাহিত্যকর্ম নয়, বরং পুরো সাহিত্যের ইতিহাস ব্যাখ্যায়ও তাঁরা এ তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান, হ্যারল্ড ব্লুম যেমন তাঁর বিখ্যাত 'এ্যাংজাইটি অব ইনফ্লুয়েন্স' বিষয়ক ভাবনায় প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ইডিপাস কমপ্লেক্স সংক্রান্ত ধারণা। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে উত্তরসূরী লেখকরা পূর্বসূরী মহারথী লেখকদের বিষয়ে আতঙ্কিত থাকেন যেমন ইডিপাস কমপ্লেক্সে শিশু আতঙ্কে থাকে তার বাবাকে নিয়ে।

ঘ) সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণে মার্কসবাদকে পাশ কাটানোর প্রয়োজনেই হয়তো তাঁরা মনোরাজ্যের সংকটকে সকল সংকটের উৎপত্তিস্থল হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক সকল প্রসঙ্গকে মনোরাজ্যের সংকটের মাঝে লীন করে দেন। ফলে সাইকোএ্যানালিটিক ক্রিটিকদের কাছে ব্যক্তিমানসের চেয়ে বড় কোনো প্রসঙ্গ মানবজীবনে নেই।

সাইকোএ্যানালাইটিকাল সমালোচনাতত্ত্বে আমাদের এতক্ষণের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ফ্রয়েডিয় সাইকোএ্যানালাইসিস। কিন্তু ফ্রয়েডের পরে মনোবিজ্ঞানীরা অনেকে সাইকোএ্যানালাইসিস সম্পর্কে নতুনতর ধারণার অবতারণা করেছেন। তাঁদের হাত ধরে সাইকোএ্যানালাইলিটিকাল সমালোচনাতত্ত্বেও প্রবেশ করেছে নতুনতর ধারণা ও ভাবনা। পরবর্তী প্রজন্মের সেই সাইকোএ্যানালাইলিটিকাল সমালোচনাতত্ত্বে সবচেয়ে বড় অবদান দুজনের। তাঁরা হলেন কার্ল ইয়ুঙ (Carl Jung: 1875-1961) ও জ্যাক লাকাঁ (Jacques Lacan: 1901 - 1981)।

কার্ল ইয়ুঙও ফ্রয়েডের মতো মনোচিকিৎসক ছিলেন। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তিনি ফ্রয়েডের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। আট বছরের অধিককাল তিনি ফ্রয়েডের সহযোগী হিসেবেই কাজ করেছেন। ১৯১২ সালে ইয়ুঙের 'সাইকোলজি অব দি আনকনশাস'

নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে গুরু-শিষ্যের এ সম্পর্ক চুরমার হয়ে যায়। ফ্রয়েড তাঁর এই গুরুমারা শিষ্যকে তখন থেকে বর্জন করেন।

এই গুরুমারা শিষ্যের হাতেই ফ্রয়েডের মনের মানচিত্র এক নতুন রেখায় নতুনভাবে নির্মিত হয়। ফ্রয়েড বলেছিলেন মনের অচেতন অংশ পুরোটা নির্মিত হয় ব্যক্তির অবদমিত ইদ দ্বারা। অচেতনে জমে থাকা সব কিছুই ব্যক্তির নিজের জীবনের স্মৃতি, ঘটনা ও ভাবনার তলানি। কিন্তু ইয়ুঙ বললেন অচেতনের সবটা ব্যক্তির নিজের জীবন থেকে পাওয়া নয়। এখানে জমে আছে এমন অনেক কিছু যা ব্যক্তির নিজ জীবন থেকে অর্জিত নয়, বরং পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার থেকে পাওয়া। ব্যক্তি শারীরিকভাবে যেমন তাঁর বাবা-মার কাছে ঋণী কারণ তার হাড়-মাংস সব তার বাবা-মার কোষ থেকে তৈরি, তেমনই তার মনের জগতের জন্যও তার বাবা-মা এবং পূর্ববর্তী পুরো মানবসমাজের কাছে ঋণী কারণ তার মনের জগতের অচেতন অংশে তার নিজের জীবনের ঘটনাদি প্রবেশের পূর্বেই সেখানে প্রবিষ্ট হয়ে আছে তার বাবা-মা ও পূর্ববর্তী মানবসমাজের অভিজ্ঞতার অনেক বিষয়। মনের অচেতন অংশে জমে থাকা পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া এইসব বিষয়কে ইয়ুঙ বলেছেন 'আর্কেটাইপ'।

মনের অচেতনের এই অংশ কারো নিজ জীবনের অভিজ্ঞার ফসল না হয়ে বরং সমগ্র মানবজাতির সমগ্র মানব ইতিহাস থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফসল। তাই ইয়ুঙিয় ধারণায় মনের অচেতনের এই অংশ হলো সামগ্রিক অচেতন বা 'কালেকটিভ আনকনশাস'। কালেকটিভ আনকনশাসের একটি সর্বজনপরিচিত উদাহরণ হলো অন্ধকারের ভয়। অন্ধকারের সাথে ভয়ের সম্পর্ক ব্যক্তির নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হওয়ার আগেই পূর্বপুরুষ অর্থাৎ সেই গুহামানবের অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে মনে অধিকৃত হয়ে আছে। গুহার জীবন থেকে বের হওয়ার পরেও মানবজাতির অভিজ্ঞতায় কালে কালে জড়ো হতে থাকে এমন অনেক সাধারণ ঘটনা ও চরিত্র-ধারা যেগুলো বিশ্বজুড়ে আর্কেটাইপের একটি ভাণ্ডার রচনা করেছে। আর সে ভাণ্ডার বেশিরভাগ স্থান করে নিয়েছে লোকায়ত পুরাণে, ধর্মগ্রন্থে আর মানব মনের গভীর অচেতনে। এসব আর্কেটাইপের মধ্যে যেমন রয়েছে ফাদার ইমেজ। আর্কেটাইপ ফাদার ইমেজ থেকে আমরা জানি ও অনুভব করি যে, পৃথিবীর সর্বকালে সর্বসমাজে পিতা এক শক্তির প্রতীক। এমনই আরেক আর্কেটাইপ 'পারসোনা ইমেজ' (persona image)। পারসোনা ইমেজ থেকে আমরা জানি যে, পৃথিবীর সর্বকালে সর্বসমাজে প্রতিটি মানুষ চেয়েছে তার নিজের প্রতিচ্ছবিটি এমনভাবে সমাজে উপস্থাপিত হোক যাতে তা সকলের পছন্দের ও আদরের হয় এবং তার কোনো দোষ কোথাও উচ্চারিত না হোক। ইয়ুঙের মতে এই আর্কেটাইপগুলো প্রতিটি মানুষ পুরো মানবজাতির উত্তরাধিকার রূপে তার মনের গভীর অচেতন অংশে বহন করে।

সাইকোএ্যানালাইসিস বিষয়ক ধারণায় ইয়ুঙের সংযোজন মাত্র মনের অচেতন অংশে এই আর্কেটাইপের উপস্থিতি শনাক্তকরণ। ইয়ুঙের এই নতুন সংযোজন চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত সাইকোএ্যানালাইসিস বিষয়ে সামান্য একটি ঘটনা হলেও সাইকোএ্যানালাইটিকাল সাহিত্যতত্ত্বে সেই সামান্য অংশের অবদানই অসামান্য। মনের অচেতন অংশে নিজের অভিজ্ঞতার বাইরের বস্তু আছে- ইয়ুঙের এই কথা মেনে নেয়ার পরে আর ফ্রয়েডের সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলার সুযোগ নেই যে, সাহিত্য হলো সম্পূর্ণভাবে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অবদমিত ইদের প্রকাশ। ফলে সাহিত্য আর লেখকের ব্যক্তিগত ফ্যান্টাসি বা ডেড্রিমিং এর প্রকাশ মাত্র নয়। বরং এখন থেকে বলতে হবে যে, সাহিত্যে ব্যক্তির অবদমিত ইদের প্রকাশও থাকতে পারে এবং একই সাথে কালেকটিভ আনকনশাসে অবস্থিত মানবজাতির সর্বজনীন আর্কেটাইপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আচরণাদি ও আবেগের প্রকাশও থাকতে পারে। ইয়ুঙ সাইকোএ্যানালাইটিকাল সাহিত্যতত্ত্বকে এভাবে ব্যক্তিক পর্যায় থেকে সামষ্টিক পর্যায়ে উন্নীত করলেন।

পরোক্ষে ইয়ুঙিয় এই ভাবনা দ্বারা ফ্রয়েডিয় সাইকোএ্যানালাইটিকাল সাহিত্যতত্ত্বের একটি সীমাবদ্ধতাও দূর হলো। সাইকোএ্যানালাইটিকাল সাহিত্যতত্ত্বের একটি সীমাবদ্ধতা এই ছিল যে, ফ্রয়েডিয় ভাবনা অনুযায়ী সাহিত্য যদি লেখকের অর্থাৎ কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনের অবদমিত ইদের ফসলই হয় তাহলে সেই সাহিত্যকর্মে অন্য একজন মানুষের অর্থাৎ পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার তো কোনো যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। লেখকের অবদমনের জগৎ নিয়ে পাঠক ভাবতে যাবেন কোন দুঃখে? এই প্রশ্নের কোনো যুৎসই উত্তর ফ্রয়েডিয় সাইকোএ্যানালাইসিসে ছিল না। ইয়ুঙিয় ভাবনার বদৌলতে এবার আমরা এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি যে, লেখক তার মনের অচেতনে কালেকটিভ আনকনশাস বহন করেন, সেখানে তিনি সমগ্র মানবজাতির আর্কেটাইপ বহন করেন বিধায় তাঁর সে অচেতনের প্রকাশে দুনিয়ার সকল মানুষের হিস্যা রয়েছে। একারণেই একটি গ্রিক সাহিত্যকর্ম ভারতীয় পাঠকের কাছে, কিংবা ইনকা সমাজের একটি সাহিত্যকর্ম ইউরোপিয় পাঠকের কাছে সমানভবে আবেদন সৃষ্টির যোগ্যতা রাখে।

ফ্রয়েডিয় ও ইয়ুঙিয় উভয় ঘরানার সাইকোএ্যানালাইটিকাল সাহিত্যতত্ত্বেই এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য যে, সাহিত্যকর্ম হলো ভাষায় তৈরি একটি ন্যারেটিভ যার মধ্যে লুকায়িত থাকে লেখকের মনের অচেতন রাজ্যের বিষয়াদি। সাইকোএ্যানালাইটিকাল সাহিত্যতত্ত্ব পাঠককে খুঁজে দিতে সাহায্য করে ভাষায় গড়া ন্যারেটিভের মধ্যে লুকায়িত মনের অচেতন রাজ্যের সেইসকল বিষয়াদিকে, হোক সে অচেতন রাজ্য লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার হিমাগার, কিংবা হোক সে অচেতন রাজ্য সমগ্র মানবের আর্কেটাইপাল অভিজ্ঞতার হিমাগার। উভয় ঘরানায়ই ভাষাকে দেখা হয় মনের অচেতন রাজ্যের বিষয়াদিকে উপস্থাপনের হাতিয়ার হিসেবে। কিন্তু আমাদের আলোচনার তৃতীয় তাত্ত্বিক জ্যাক লাকাঁ (Jacques Lacan: 1901 - 1981) ভাষাকে মনের অচেতন রাজ্যের বিষয়াদি উপস্থাপনের হাতিয়ার হিসেবে দেখেন না, বরং তিনি মনে করেন ভাষা নিজেই আমাদের মনের অচেতন রাজ্য। ব্যাপারটা আসলেই একটু তালঘোল পাকানোর মতো। তবে আমরা চেষ্টা করবো যতটা সম্ভব সোজা করে তুলতে।

অচেতন সম্পর্কে লাকাঁর এই বিপ্লবী ভাবনা বুঝতে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে মনের কার্যক্রম বিষয়ে লাকাঁ কী বলেছেন। লাকাঁর মতে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক রাজ্য নিয়ন্ত্রিত হয় মনের তিন ধারার বা তিন পর্যায়ের কার্যক্রম দ্বারা। এই তিনটি ধারা হলো: ক) প্রতিচ্ছবি-সৃষ্ট (imaginary), খ) প্রতীকী (symbolic) ও গ) বাস্তব (real)। এই তিনের পারস্পরিকতায় ও সংশ্লেষে যে ঘটনাজাল তৈরি হয় লাকাঁ তার নাম দিয়েছেন বোরোমিয়ান রিং (Borromean rings)। ইতালির বোরোমিয় বংশের অভিজাত পরিবার এই জটিল রিং তাদের কোট অব আর্মস রূপে ব্যবহার করতো বিধায় লাকাঁ মনের তিন ধারার কার্যক্রমে উদ্ভূত ঘটনাজালের জটিলতা বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এছাড়া বোরোমিয়ান রিঙের যে কোনো একটি ভেঙে গেলে পুরো বোরোমিয়ান রিঙের বিন্যাস ভেঙে পড়তো বলে লাকাঁ এই শব্দ ব্যবহার করে একই সাথে বুঝিয়েছেন যে, মনের এই ঘটনাধারার তিনটির যে কোনো একটি ভেঙে পড়লে পুরো মনের কার্যক্রমই ভেঙে পড়বে। এখানে একটি কথা বলে নেয়া জরুরি। দেখা যাচ্ছে আমরা ইংরেজি imaginary শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ লিখেছি 'প্রতিচ্ছবি-সৃষ্ট'। কেন এর অর্থ 'কাল্পনিক' লেখা হলো না সেটি অবশ্যই খটকা লাগার মতো একটা বিষয়। আসলে লাকাঁ কাল্পনিক অর্থে imaginary শব্দ ব্যবহার করেননি। তিনি imaginary বলতে বুঝিয়েছেন image থেকে উদ্ভূত। লাকাঁর এই উদ্দিষ্ট অর্থের সাথে সম্পর্ক রাখতেই আমরা imaginary শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ লিখেছি প্রতিচ্ছবি-সৃষ্ট বা প্রতিচ্ছবি-উদ্ভূত। 'প্রতিচ্ছবি-সৃষ্ট' শব্দটি সাইকোলজির কোনো পরিভাষারূপে বাংলায় স্বীকৃত নয় বিধায় আমরা পরবর্তী আলোচনায় বাংলায় 'ইমাজিনারি' শব্দটিই ব্যবহার করবো। সাইকোএ্যানালাইসিস বিষয়ে লাকাঁর স্বাতন্ত্র্য বুঝতে প্রথমত আমাদেরকে মনের এই তিন ধারার কার্যক্রম বুঝতে হবে। এরপরে আমরা দেখবো মনের কার্যক্রম বিষয়ে তাঁর ভাবনার এই স্বাতন্ত্র্য কীভাবে সাইকোএ্যানালাইটিকাল সাহিত্যতত্ত্বকে নতুন রূপ দিয়েছে।

মনের ইমাজিনারি কার্যক্রম শিশুর জন্মের পর থেকেই শুরু হয়। লাকাঁ এ কার্যক্রমকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন: **অমলেট স্টেজ** (hommelette stage) ও **মিরর স্টেজ** (mirror stage)। 'homme' ও 'omelette' এই দুই শব্দের অর্থ এক শব্দের মধ্যে ঠেসে আটকানোর লক্ষ্য নিয়ে 'hommelette' শব্দটি ঐ দুই শব্দ পেঁচিয়ে বানানো। ফরাসি শব্দ 'homme' অর্থ ব্যক্তি, আর 'omelette' অর্থ আমরা সবাই জানি ডিম গুলিয়ে ডিমের কুসুম ও লালার আকার নিশ্চিহ্ন করে কড়াইয়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে তেলে ভাজা। ফলে ঐ দুই শব্দ পেঁচিয়ে বানানো 'hommelette' শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ হলো ব্যক্তির শিশুরূপের সেই পর্যায় যখন পর্যন্ত শিশুটি তার মনের মধ্যে নিজের নির্দিষ্ট কোনো আকার ও রূপ দাঁড় করাতে পারেনি। শিশুর মনে তার নিজের অস্তিত্ব তখন গোলানো ডিমের মতো আকারহীন। এই আকারহীনতা থেকে শিশুর নিজ অস্তিত্ব তার মনে আকার পেতে শুরু করে মিরর স্টেজে। এই স্টেজ শুরু হয় শিশুর ছয় মাস বয়স থেকে এবং তা স্থায়ী হয় আঠারো মাস পর্যন্ত।

মিরর স্টেজে শিশু প্রথম তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে বুঝতে শুরু করে মিররে অর্থাৎ আয়নায় প্রতিফলিত নিজের রূপ দেখে। আয়নায় নিজেকে দেখে সে প্রথম তার পুরো শরীরটাকে একত্রে বুঝতে শুরু করে এবং অনুভব করে যে এই পুরো শরীরটার মালিক সে। সে বুঝতে পারে তার পাশের পুরো দুনিয়া থেকে সে কীভাবে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ। সে হাত নাড়ালে আয়নার ওপারে গোটা দেহটার হাত নড়ে, সে বসে পড়লে ওপারের দেহটাও বসে পড়ে। আয়নার ওপারের দেহটাকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার মধ্য দিয়ে সে একধরনের শক্তি ও সম্পূর্ণতা অনুভব করে। সে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করে। এই সবটাই সম্ভব হয় আয়নার ওপারের ইমেজটাকে নিজের বলে শনাক্ত করার মধ্য দিয়ে। ইমেজের ওপর ভিত্তি করে অস্তিত্বশীল বিধায় শিশুর এই আনন্দ, এই সম্পূর্ণতা বোধ এবং সর্বোপরি নিজেকে আবিষ্কারের মানসিক প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণই ইমাজিনারি। লাকাঁর মতে আয়নার মধ্যের ছবিই 'আসল আমি' (Ideal 'I')- এই ভাবনাই হলো 'ইগো'র উন্মেষ যা অর্জিত হয় মিরর স্টেজে। ব্যক্তির 'ইগো' এভাবে অর্জিত হয় বলে ইগো সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে দুটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এর উৎপত্তি থেকেই অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে- একটি মিসরিকগনিশন (misrecognition) ও অপরটি এলিয়েনেশন (alienaton)। মিসরিকগনিশন এ কারণে যে, ইগো ব্যক্তির জীবনে অস্তিত্বশীলই হয়েছে নিজের আয়নায় দেখা ছবি থেকে যে ছবিটি বাস্তবতার নিরিখে অলীক এক অস্তিত্ব। নিজের আসল অস্তিত্বকে পাশে ঠেলে আয়নার ছবিতে নিজেকে ভুলভাবে শনাক্ত করা হয়েছে বিধায় সেই শনাক্তকরণের ওপর দাঁড়ানো ইগোও মিসরিকগনাইজড অর্থাৎ ভুলভাবে শনাক্তকৃত চেতনা হতে বাধ্য। আর এলিয়েনেশন একারণে যে, ইগো অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি তার নিজ অস্তিত্বকে এলিনিয়েট করে (alienate) অর্থাৎ দূরে ঠেলে দিয়ে আয়নায় প্রতিফলিত অলীক অস্তিত্বকে আপন করে নিয়েছে। ফলে ব্যক্তির সচেতনতার উন্মেষ তথা ইগোর উন্মেষ জন্মগতভাবেই এক অলীক (misrecognised and alienated) অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে দাঁড়ানো। আমরা লাকাঁর ইমাজিনারি পর্যায়ের মানসিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে দেখলাম যে, ব্যক্তির সচেতনতা বা ইগো ব্যক্তি যা নয় তার ওপর দাঁড়ানো; লাকাঁর ভাষায় ব্যক্তির (subject) ওপর নয় বরং 'অন্য' (other)- এর ওপর দাঁড়ানো।

এবার আসা যাক লাকাঁ-কথিত প্রতীকী বা সিম্বলিক ধারার কর্মকাণ্ডের আলোচনায়। এ আলোচনায় আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে কাঠামোবাদীদের প্রদত্ত ধারণা। কাঠামোবাদ থেকেই আমরা জানি সিগনিফায়ার তার অর্থ সিগনিফাইড থেকে গ্রহণ করে না, বরং সিগনিফায়ারগুলো তাদের পারস্পরিক বৈপরীত্যের সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে অর্থ সৃষ্টি করে। লাকাঁর মতে সিগনিফায়ারগুলো একটি ভাষার বা লাঙের অভ্যন্তরে যে কাজ করে প্রতিটি মানুষও গোটা মানব সমাজের অভ্যন্তরে বা নেটওয়ার্কে সেই কাজটি করে। কাঠামোগতভাবে প্রতিটি সিগনিফায়ারের সাথে লাঙের যে সম্পর্ক, প্রতিটি মানুষের সাথে পুরো মানব সমাজের সেই সম্পর্ক। সিগনিফায়ারগুলোর যেমন নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং প্রতিটি সিগনিফায়ারের অর্থ যেমন অপরাপর সিগনিফায়ারের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি হয়, তেমনি কোনো ব্যক্তিরই নিজস্ব কোনো অর্থ বা আইডেনটিটি নেই। লাঙ বা ভাষার মাঝে

সিগনিফায়ারগুলো যেমন প্রতীক মাত্র, সমাজের কাঠামোতে ব্যক্তিগুলোও তেমনি সম্পর্কের প্রতীক মাত্র। মানুষের সামাজিক ও মনোজাগতিক জীবনের সবকিছুই লাকাঁর মতে এই প্রতীকের কাঠামোর অধীন। কারণ, মানুষের অস্তিত্ব ভাষার কাঠামোর বাইরে অসম্ভব, আর সেই ভাষা কাঠামো দাঁড়িয়েই আছে সাইন/ সিগনিফায়ার বা প্রতীকের ওপর। প্রতিটি মানুষের জীবনই অর্থবহ হয় এই ভাষা কাঠামোর মধ্যে অস্তিত্বশীল হওয়ার মধ্য দিয়ে। ভাষা বা প্রতীকের এই কাঠামো আমাদের অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করে কারণ ভাষার ওপর না দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্বের জানান দিতে পারি না। সুতরাং, এই ভাষার প্রতীক বা সিগনিফায়ার 'আমি'- এর মধ্য দিয়ে আমি যখন আমার নিজেকে চিহ্নিত করি তখন মিরর স্টেজে যেমন নিজেকে চিহ্নিত করতে গিয়ে ছবিকে চিহ্নিত করেছি তেমনি এবার নিজেকে চিহ্নিত করতে গিয়ে একটি প্রতীককে চিহ্নিত করি মাত্র। প্রতীকের বেড়াজাল পার করে সত্যিকার নিজেকে চিহ্নিত করা ভাষার মাধ্যমে সম্ভব হয় না। ফলে মিরর স্টেজে ব্যক্তির নিজের প্রকাশ যেমন 'অন্য' (other)- এর ওপর দাঁড়ানো ছিল, আমরা দেখছি মনের সিম্বলিক কার্যক্রম পর্যায়েও ব্যক্তির নিজের (subject) প্রকাশ তেমনি আরেক other- এর ওপর দাঁড়ানো। মিরর স্টেজের other-টি ব্যক্তি সরে গেলে বা ব্যক্তি মরে গেলে সরে যায় বা মরে যায়, কিন্তু ভাষার এই other-টি ব্যক্তি সরে বা মরে গেলেও একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, সরেও না, মরেও না। ফলে লাকাঁর মতে এই other-টি মিরর সেটেজের other-এর চেয়ে অনেক বেশি বুজুর্গ, অনেক বেশি কাবেল। তাই ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তির (subject) যে other-রূপ প্রকাশ, সেটিকে লাকাঁ বলেছেন The Big Other। মিরর ইমেজ হচ্ছে ছোট 'আদার' এবং ভাষা হচ্ছে বড় 'আদার'। এই 'বিগ আদার' অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্বের সবটুকু নির্মিত। তার অস্তিত্বের বা ব্যক্তিত্বের সচেতন অংশ (conscious self) এবং অচেতন অংশ (unconscious self) সবটুকুই এই 'বিগ আদার' বা ভাষার নির্মাণ। ফলে বলা যায়, ব্যক্তিত্বের সচেতন অংশ (conscious self) এবং অচেতন অংশ (unconscious self) উভয়ের অস্তিত্বই ভাষার মধ্যে নিহিত। এই কথাই একটু ঘুরিয়ে এভাবে বলা যায় যে, লাকাঁর মতে ভাষা মানুষের অচেতন প্রকাশের হাতিয়ার মাত্র নয়, বরং ভাষাই তার অচেতন (The unconscious)।

সাইকোএ্যানালাইসিস বিষয়ক অন্য দুই চিন্তকের সাথে লাকাঁর পার্থক্যের এই পয়েন্টটি প্রমাণের লক্ষ্য নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম। কিন্তু এটি প্রমাণের মধ্য দিয়ে সাইকোএ্যানালাইটিকাল সাহিত্যতত্ত্ব বোঝার জন্য সরাসরি কী লাভ হলো অর্থাৎ সাইকোএ্যানালাইটিকাল সাহিত্যতত্ত্বের সাথে এতক্ষণের আলোচনার কী সম্পর্ক তা এখনো কিছুই বলা হলো না। তবে সে সম্পর্ক বিষয়ে বলার আগে লাকাঁর বর্ণিত মনের তিন ধারার কর্মকাণ্ডের তৃতীয় ধারা অর্থাৎ বাস্তব (real) ধারা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। লাকাঁর বর্ণনামতে মানুষের মন এই বাস্তবের (real) সাক্ষাৎ কালেভদ্রে পেলেও তার প্রকাশ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তার অস্তিত্বের সবটুকু প্রকাশযোগ্য নির্মাণ যেহেতু ভাষার, এবং যেহেতু সেই ভাষা হলো তার আদত অস্তিত্ব নয়, বরং আদত অস্তিত্ব থেকে দূরের এক 'অন্য' (other), সেহেতু, সেই ভাষা বা 'বিগ আদার' তার অনুভবের বাস্তবকে প্রকাশের কোনো যোগ্যতা রাখে না। মানুষ তার আবেগের বা অনুভবের তীব্রতায় যখন এমন অবস্থার শিকার হয় যে সে খুঁজে পায় না কী বলবে, তার অভ্যন্তরকে প্রকাশের অযোগ্যতায় যখন সে নির্বাক হয়ে যায়, তখন সে মূলত তার অস্তিত্বে এই বাস্তবকে (real) অনুভব করে।

এবার আমরা দেখতে চেষ্টা করবো সাইকোএ্যানালাইসিস বিষয়ে লাকাঁর ধারণাসমূহের যেগুলো এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম সাইকোএ্যানালাইটিকাল সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে সেগুলোর অবদান বা প্রভাব কী। ইমাজিনারি আর সিম্বলিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে লাকাঁর ধারণার উপরিস্থিত বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝি যে ফ্রয়েড ও ইয়ুঙের সাইকোএ্যানালাইসিসের ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো সাহিত্যতত্ত্ব লাকাঁর ক্ষেত্রে আর কাজ করছে না, কারণ একজন লাকানিয়ান ক্রিটিক আর সাহিত্যে সাইকোএ্যানালাইটিক লক্ষণাদি (যেমন: ইডিপাস কমপ্লেক্স, ফাদার ফিক্সেশন, মাদার ফিক্সেশন, ফ্যান্টাসি, সাবলিমেশন, প্যারাপ্রাক্সিস ইত্যাদি) খুঁজে বের করার মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তিজীবনের অচেতন চিহ্নিত করার চেষ্টা করবেন না; কিংবা আর্কেটাইপাল বিষয়াদি খুঁজে বের করার মধ্য দিয়ে মানবজাতির সামগ্রিক অচেতনকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবেন না। একজন লাকানিয়ান ক্রিটিকের কাছে সাহিত্যে অচেতনের নিয়ন্ত্রণ দেখাতে অত দূরের বস্তু খোঁজার দরকার নেই। তিনি সাহিত্যে অচেতনের নিয়ন্ত্রণ বিশ্লেষণ করতে শুধু সাহিত্যকর্মটির ভাষা বিশ্লেষণকেই সর্বতো যথেষ্ট মনে করবেন। ফ্রয়েডের মতো তিনি 'কনডেনসেশন' বা 'ডিসপ্লেসমেন্ট' টেকনিক দিয়ে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে যাবেন না। তিনি বরং 'মেটাফর' আর 'মেটোনিমি' টেকনিক দিয়ে ভাষা বিশ্লেষণ করবেন, যেহেতু লাকাঁর চিন্তা থেকে তিনি জানেন যে, ফ্রয়েডিয় সাইকোএ্যানালাইসিসের 'কনডেনসেশন' বা 'ডিসপ্লেসমেন্ট'ই ভাষায় 'মেটাফর' আর 'মেটোনিমি'র মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অচেতনকে এভাবে ভাষার মধ্যে খোঁজার সময় লাকানিয়ান ক্রিটিক বরং কাজ করেন টেক্সটের সিগনিফায়ারগুলো নিয়ে আর সে কাজে তার চোখে পড়বে সিগনিফায়ারগুলোর মধ্যকার অর্থের বহুরূপতা, অর্থদ্বৈততা ও অর্থের পারস্পরিক বিরুদ্ধতা। এই দ্বিবিধ বা বহুবিধ অর্থসারির মধ্যে কোন সারি কনশাস সেলফ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর কোন সারি আনকনশাস সেলফের নির্মাণ সেটিও তার বিশ্লেষণের বিষয়। ফলে একজন লাকানিয়ান ক্রিটিকের কাজ একইসাথে সাইকোএ্যানলাইটিকাল থিয়রি ও পোস্টস্ট্রাকচারালিজম দ্বারা নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ লাকানিয়ান সাহিত্য সমালোচনা একইসাথে মনঃসমীক্ষণবাদী ও বিনির্মাণবাদী।

ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম বা নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনা

অন্যান্য অনেক মতবদের মতো ফেমিনিজম বা নারীবাদও শুরু থেকে সাহিত্যতত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। শুরুতে এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবেই প্রচলিত ও প্রচারিত ছিল। বিংশ শতকে এসে নারীবাদ সাহিত্যতত্ত্বে জায়গা করে নিতে শুরু করে। সাহিত্যতত্ত্বে নারীবাদ প্রথমদিকে পুরুষ লেখকদের লেখায় নারীর অবমূল্যায়িত ও নিগৃহীত চিত্র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। পরবর্তী সময়ে নারীবাদ সাহিত্যকর্মের অর্থনির্মাণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার সংযোজনে সফলতা প্রদর্শন করে। সাহিত্যতত্ত্বে নারীবাদের এই ভূমিকা ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই প্রথমে আমরা নারীবাদ বিকাশের পর্যায়গুলো ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

আধুনিক সভ্যতায় নারীবাদের আবির্ভাব রাজনৈতিক উদারতন্ত্রের (political theory of liberalism) হাত ধরে। রাজনৈতিক উদারতন্ত্রের বক্তব্য ছিল যে, সরকার ব্যবস্থায় সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ থাকতে হবে এবং আইনের চোখে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদায় আনতে হবে। এই ভাবনার ছায়াতলে দাঁড়িয়েই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি অনুযায়ী নারীবাদের প্রথম উচ্চারণটি করলেন মেরি ওলস্টোনক্রাফট (Mary Wollstonecraft: 1759-1797) ১৭৯৮ সালে তাঁর প্রকাশিত A Vindication of the Rights of Women গ্রন্থের মাধ্যমে। ১৮৬৯ সালে দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থ The Subjection of Women উদারতন্ত্রের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা নারীবাদী আন্দোলনকে আরো একধাপ এগিয়ে দিলো। মেরি ওলস্টোনক্রাফটের হাতে সূচিত নারীবাদের এই ধারাকে আমরা লিবারেল ফেমিনিজম নামে জানি।

ওলস্টোনক্রাফট, স্টুয়ার্ট মিল এবং এঁদের সাথে সহমত পোষণকারী অন্যান্য উদারতান্ত্রিক নারীবাদীদের বক্তব্য থেকে মনে হয়েছিল যে, নারীদেরকে ভোটাধিকার দিয়ে দেয়ার পরে নারীবাদীদের আর নতুন কিছু চাওয়ার থাকবে না। কিন্তু ইতিহাস দেখালো অন্য চিত্র। বিংশ শতকের প্রথম দশকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ দেশে নারীদেরকে ভোটাধিকার দিয়ে দেয়া হলো। রাষ্ট্রে নারীরা পুরুষের সমমর্যাদায় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত হলো। এর কিছুদিনেই নারীরা অনুভব করলো যে, এতে নারীদের অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি অর্জিত হয়নি। ভোটাধিকার ও নাগরিক হিসেবে সমমর্যাদার ঘোষণা নারীকে সমাজ, রাজনীতি, আইন, অর্থনীতি কোনোখানেই পুরুষের সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারেনি। এ অবস্থায় উদারতন্ত্র বা লিবারেলিজম নারীমুক্তির উপায় বিধানে ব্যর্থ হওয়ায় মার্কসিজম নামে রাজনৈতিক অন্য একটি নতুন মতবাদ নারীমুক্তির নতুন এক উপায় নিয়ে হাজির হলো। লিবারেলিজম মনে করেছিল ক্ষমতা নিহিত থাকে সরকারে, আর মার্কসিজম বললো যে, ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু সরকারে থাকে না, থাকে অর্থনীতিতে। মার্কস বললেন ক্ষমতা থাকে তাদের হাতে যারা উৎপাদনের উপায়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে। নতুন নারীবাদের পক্ষে ব্যাপারটাকে আরো খোলাসা করে এঙ্গেলস বোঝালেন যে, সমাজে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা নীতি আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই সমাজে নারীরা পুরুষের অধীন হতে শুরু করেছে। তাই তিনি বললেন সমাজ এই ব্যক্তিমালিকানা বা পুঁজিবাদ থেকে মুক্ত হলেই নারীরাও পুরুষের অধীনতা থেকে মুক্তি পাবে। বিংশশতকে অনেক নারীবাদীই এই মতবাদের সমর্থনে নারীমুক্তির আন্দোলনে মাঠে নেমেছিলেন। নারীবাদের এই ধারার নাম মার্কসিস্ট ফেমিনিজম।

জুলিয়েট মিচেল (Juliet Mitchell: 1940-) নামে একজন খ্যাতনামা নারীবাদী এই মার্কসবাদী ভাবনার সাথে আরো একটি ভাবনার যোগ ঘটালেন। তিনি বললেন নারীরা শুধু পুঁজিবাদের কারণেই নিগৃহীত নয়, তাদের নিগ্রহের আরেকটি বড় কারণ হলো পিতৃতান্ত্রিকতা (patriarchy)। এই ধারার নারীবাদীরা বলছেন যে, নারীদের মুক্তি অর্জন করতে হলে পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্র এই দুই বুনিয়াদকেই ভেঙে ফেলতে হবে। নারীবাদের এই দ্বৈত ধারাকে মার্কসিস্ট/ সোশালিস্ট ফেমিনিজম নামে অভিহিত করা হয়।

এ পর্যন্ত নারীবাদ ছিল অন্য মতবাদ বা তত্ত্বের ওপর দাঁড়ানো। এই সব তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে সমাজের বস্তুগত কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নারীমুক্তির বাঁধাসমূহ সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান ও সেগুলো উৎপাটনের প্রচেষ্টা ছিল এযাবৎকালের নারীবাদের কাজ। গোটা সমাজকে সামগ্রিকভাবে বিচার ও বিশ্লেষণের স্বতন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে নারীবাদ কাজ করতে শুরু করেছে যখন নারীবাদ র‍্যাডিকাল ফেমিনিজম, সাইকোএ্যানালাইটিক ফেমিনিজম ও পোস্টমডার্ন ফেমিনিজমের ধারণাবলয়ে প্রবেশ করেছে তখন থেকে। এইসকল ধারণাবলয়ে প্রবেশের পরে নারীবাদে যে প্রসঙ্গটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো তা হলো সমাজে নারীরা কীভাবে 'নারী' হয়ে ওঠে এবং জেন্ডার কীভাবে সমাজের প্রতিটি বিষয়ের অর্থ তৈরিতে ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি কাঠামো অতিক্রম করে নারীবাদকে এই নতুন প্রসঙ্গে প্রবেশের পথে আহ্বান জানিয়েছিল সিমন দে বেভোয়ারের গ্রন্থ 'দি সেকেন্ড সেক্স'। সিমন দে বেভোয়ার প্রথম বলেছিলেন 'নারীরা নারী হয়ে জন্মায় না, বরং ধীরে ধীরে নারীতে পরিণত হয়' (One is not born, rather becomes a woman)। ১৯৭০ এর দশকে শুরু হয় নারীবাদের এই নব যাত্রা। এই নব যাত্রায় সমাজে জেন্ডারসৃষ্ট অর্থ অনুসন্ধান এবং তার মাধ্যমে নারীমুক্তির পথসন্ধান ফেমিনিজমের মূল কাজ হলেও সেই একই কাজ র‍্যাডিকাল ফেমিনিজম, সাইকোএ্যানালাইটিক ফেমিনিজম ও পোস্টমডার্ন ফেমিনিজম আলাদা আলাদা প্লাটফরমে সম্পাদনে ব্রতী হলো।

মূল প্রসঙ্গের সাথে সংযুক্ত করে র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্টরা প্রজননে নারীর ভূমিকাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করলেন। তাঁরা বলতে চাইলেন প্রজননের প্রচলিত রীতিপদ্ধতি নারীকে পুরুষের অধীনতায় আবদ্ধ করতে সাহায্য করে। যৌন কর্মকাণ্ড ও মাতৃ কার্যক্রমের প্রচলিত সংস্কৃতি নারীর এই অধীনতাকে স্বাভাবিক ও স্থায়ী করে তুলতে ভূমিকা রাখে। র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্ট শুলামিথ ফায়ারস্টোনের (Shulamith Firestone: 1945-2012) মতে নারীর মর্যাদা অর্জনের পথে সকল আইনি ও রাজনৈতিক বাঁধা দূর হলেও যৌনকর্মকাণ্ড ও শিশুলালন সংস্কৃতিতে নারীর বর্তমান অবস্থা ও ভূমিকা বহাল থাকলে নারীরা পুরষাধীনই থাকবে। ফায়ারস্টোনের

এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা এত যৌক্তিক যে তা অগ্রাহ্য করা দুরূহ, তবে তিনি এ বিষয়ে যা সমাধান দিয়েছেন তা বেশিরভাগ নারীবাদীরাই গ্রহণে নারাজ। তিনি বলেছেন এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে নারীদেরকে বর্তমান রীতির গর্ভধারণ থেকে সরে গিয়ে টেস্টটিউব বেবি পদ্ধতিতে যেতে হবে এবং যৌন কর্মকাণ্ডে নারীকে নিয়ামকের আসনে বসতে হবে। এই সমাধানের দ্বিতীয় অংশ অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও নারী গর্ভধারণের বর্তমান রীতি ছেড়ে দিয়ে টেস্টটিউব বেবি পদ্ধতি অবলম্বন করবে মর্মে প্রদত্ত সমাধান বেশিরভাগ নারীবাদীদের কাছেই অগ্রহণযোগ্য রয়ে গেছে। তবে র‍্যাডিকাল ফেমিনিজমের একটি বিশেষ অবদান এই যে, নারীবাদের এই রূপ প্রথম নারীর মুক্তির জন্য পুরুষের সাথে তার সমতা বিধানের প্রচেষ্টার দিকে না গিয়ে বরং নারীর সাথে পুরুষের অনস্বীকার্য পার্থক্য ও মর্যাদাব্যঞ্জক পার্থক্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সমতা নয় বরং স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দিয়েছে। র‍্যাডিকাল ফেমিনিজম নারীর স্বাতন্ত্র্যকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানিয়েছে।

এই পার্থক্যের সূত্র ধরে ১৯৭০ এর দশকের কতিপয় ফেমিনিস্ট নারীর স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের বিষয়াদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য মনস্তত্ত্বের দিকে আগ্রহী হলেন। নারীর পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের বিষয়াদি মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারীবাদীরা নারীর পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের বিষয়াদির উৎস হিসেবে এমন কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারলেন যেগুলো মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের ভাবনা থেকে অনেক আলাদা। ডরোথি ডিনারস্টিন প্রমুখ নারীবাদীরা তাদের ব্যাখ্যা ও পর্যবেক্ষণ শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, নারী ও পুরুষ মৌলিকভাবে পৃথক মনস্তত্ত্বের অধিকারী নয়, অর্থাৎ তাদের মধ্যকার পার্থক্য তাদের জন্মসূত্রে পাওয়া মনস্তত্ত্বের কোনো ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত নয়। মনস্তাত্ত্বিকভাবে তারা পৃথক বরং এ কারণে যে, মায়েরা নারীশিশুদের মনের মধ্যে সমাজে স্বীকৃত একটি আদর্শ 'নারীমূর্তি' স্থাপন করে দেয় এবং শিশুটিকে উদ্বুদ্ধ করে ঐ নারীমূর্তিটি অনুসরণ করে জীবন গড়তে। পক্ষান্তরে, মা তার ছেলেশিশুকে লালনের ক্ষেত্রে শিশুটির মনে সমাজে স্বীকৃত একজন আদর্শ পুরুষমূর্তি স্থাপন করে দেয়। ছেলেশিশুটিকে পুতুল কিনে দেয় না খেলার জন্য, বরং তাকে বল কিনে দেয় খেলার জন্য। তাদেরকে দুরকম পোশাক কিনে দেয়, তাদের ভিন্নতা মনে ও আচরণে গেঁথে দেয়া জন্য। এভাবে দুই শিশু ভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক গঠন নিয়ে বড় হয়, যে গঠন তাদের জেন্ডার থেকে সৃষ্ট নয়, বরং মাতৃলালন প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্ট। মনস্তাত্ত্বিক এই ভিন্নতার বিকাশ থেকে মুক্তির জন্য মনস্তাত্ত্বিক নারীবাদীদের প্রস্তাব হলো শিশুর লালন প্রক্রিয়ায় মা-বাবার দ্বৈত ভূমিকা থাকতে হবে যাতে তাদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যগুলো জেন্ডার দ্বারা প্রভাবিত না হয়, বরং তাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো যাতে জেন্ডারের উর্ধে থাকে। সব মিলিয়ে সাইকোএ্যানালাইটিক ফেমিনিস্টদের মূল বক্তব্য হলো নারীর মনস্তত্ত্ব পুরুষের মনস্তত্ত্ব থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র, তবে সে পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য তার জেন্ডার থেকে উদ্ভূত নয়, জন্মগতভাবে প্রাপ্ত নয়, বরং তার সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। সিমন দ্য বেভোয়ারের কথাই এভাবে তারা পুনরুচ্চারণ করলো যে, নারী নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ তাকে নারী বানায়।

গত শতকের আশির দশকে পোস্টমডার্ন ফেমিনিস্টরা আরেকটি নতুন উচ্চারণ নারীবাদে যোগ করলো। তারা বললো যে, এযাবৎকালের নারীবাদের সকল কথা যে নারীকে সামনে রেখে বলা হয়েছে সে একজন মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ নারী। অন্য নারীরা এযাবৎকালের সকল নারী আন্দোলনে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ (different)। এলিজাবেথ ভি. স্পেলম্যান (Elizabeth V. Spelman:) তাঁর Inessential Woman গ্রন্থে বললেন যে, নারীবাদে যে নারী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সে একজন মধ্যবিত্ত ও হিটারো-সেকসুয়াল নারী। এর বাইরের নারীদেরকে এই আন্দোলন বলতে গেলে নারী হিসেবেই দেখে না। পোস্টমডার্ন নারীবাদীরা চাইলো আন্দোলনটি এমন এক তত্ত্বের অধীনে সংগঠিত হোক যে তত্ত্ব সরাসরি এই ইস্যুগুলোকেও আমলে নিবে। ফলে আশির দশক থেকে নারীর বর্ণগত ভিন্নতা, এথনিক ভিন্নতা, যৌনজীবন বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, তৃতীয় লিঙ্গরূপ ভিন্নতা ইত্যাদি ভিন্নতাকে নারীবাদী আন্দোলনের ইস্যুসমূহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আমলে নেয়া হলো। পশ্চিমা আধুনিকতাবাদী তত্ত্বে তাদের প্রদর্শিত স্ট্যান্ডার্ড ব্যতীত অন্যসবকিছুকে যেভাবে 'অন্য' (other) করে রাখা হয়েছে, পোস্টমডার্ন নারীবাদীরা সেই সকল 'আদার'-এর ধারণা মুছে দিতে চাইলেন। কোনো নারীই 'আদার' হিসেবে থাকবে না। লুসে ইরিগারে (Luce Irigaray), জুলিয়া ক্রিস্তেভা (Julia Krisreva), হেলেন সিকশু (Helen Cixous) প্রমুখ ফেমিনিস্টরা নারীবাদকে এভাবে পোস্টমডার্নিজমের দিকে চালিত করলেন। তারা চাইলেন নারীবাদকে এতটা বহুত্বমুখী হতে হবে যে, এতে কোনো 'আদার'- এর সুযোগ থাকবে না।

এই 'আদার'- এর পরিসীমা থেকে নারীকে চূড়ান্ত মুক্তি দিতে পোস্টমডার্ন নারীবাদের যুগান্তকারী উচ্চারণটি করলেন জুডিথ বাটলার (Judith Butler: 1956-) তাঁর ১৯৯০ সালে প্রকাশিত Gender Trouble গ্রন্থে। তিনি বললেন নারী একটি কল্পিত সত্ত্বা (the identity of 'woman' is a fiction)। নারী নামক সত্ত্বা আছে কারণ সমাজ নারী নামক যে সত্ত্বা তৈরি করেছে নারী সেই সত্ত্বার চাওয়া অনুসারে কাজ করছে। সমাজের চাওয়া অনুসারে সম্পাদিত নারীর ঐ কাজগুলোর বাইরে নারী নামক কোনো মৌলিক সত্ত্বা (essence) নেই। সমাজের প্রত্যাশিত ঐ কাজগুলো যেগুলো দিয়ে নারীর সত্ত্বা তৈরি হয় সেগুলো নারী ছেড়ে দিক তাহলে 'নারী' নামক কোনো 'বিচ্ছিন্ন' সত্ত্বাও তৈরি হবে না আর সেই কল্পিত সত্ত্বাকে ঘিরে তার মুক্তির তথা 'নারীমুক্তি'র কোনো আন্দোলনও প্রয়োজন হবে না। এই ছিল নারীমুক্তির পোস্টমডার্ন প্রেসক্রিপশন। স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ নারীবাদীদের কাছে এই পোস্টমডার্ন নারীবাদ এবং নারীমুক্তির এই পোস্টমডার্ন প্রেসক্রিপশন ভালো লাগেনি। তবে যাদের ভালো লেগেছে তারা কিন্তু জোর দিয়ে বলছে যে, এই প্রেসক্রিপশনই পিতৃতন্ত্র থেকে বের হওয়ার মোক্ষম উপায়।

অবশ্য নারীবাদ পোস্টমডার্ন পর্যন্ত এসেই থেমে যায়নি। নারীবাদের তৃতীয় ঢেউ এসেছে পোস্টমডার্নেরও পরে। তৃতীয় ঢেউয়ের নারীবাদীরা বলছে, 'চুলোয় যাক আপনাদের সব তত্ত্ব, আমরা নারীবাদী আমাদের যাপিত জীবন দিয়ে, কোনো তত্ত্ব দিয়ে নয়'। তাদের বক্তব্য হলো- নারীমুক্তির কোনো একক উত্তর বা উপায় নেই; প্রতিটি নারীকে তার যাপিত জীবন থেকে বুঝতে হবে তার সমস্যা কী

এবং সে সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ কী। প্রত্যেকের সমস্যা আলাদা এবং তার সমাধানও আলাদা। তত্ত্ব এ সমাধানের কোনো পথ বাৎলায় না, বরং ঝামেলা বাড়ায়।

নারীবাদী তত্ত্ব নিয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা হলো তার মূল প্রসঙ্গ সাহিত্য নয়, তার মূল প্রসঙ্গ ছিল শুধুই নারীবাদ। নারীবাদী এই সকল তত্ত্ব সাহিত্যতত্ত্বকে, বিশেষ করে সাহিত্য-সমালোচনাকে, কীভাবে কতটুকু প্রভাবিত করলো, কিংবা বলা যায় সাহিত্য-সমালোচনার তত্ত্বে ও প্রক্রিয়ায় কী অবদান রাখলো এবারে আমরা সেই আলোচনায় অগ্রসর হবো।

নারীবাদী তত্ত্বের প্রথম গ্রন্থ A Vindication of the Rights of Women (1792) সাহিত্য সমালোচনার কোনো তত্ত্ব উপস্থাপন না করলেও, সেই গ্রন্থেই নারীর অধিকার-বঞ্চনার বিষয়টি প্রমাণ করতে এবং এবিষয়ক লেখকের বক্তব্যকে জোরালো করে তুলতে মিল্টন, পোপ ও রুশোর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এমনকি একেবারে বিংশ শতকের গ্রন্থ 'দি সেকেন্ড সেক্স' যাকে বলা যায় আধুনিক নারীবাদের সূতিকাগার সেই গ্রন্থেও ডি এইচ লরেন্সের উপন্যাসে নারীর চিত্রায়ন নিয়ে আলোচনা রয়েছে। নারীবাদী এসকল তাত্ত্বিক গ্রন্থে সাহিত্য নিয়ে আলোচনার দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায় যে, নারীবাদী তত্ত্ব সাহিত্য সমালোচনার কোনো স্বতন্ত্র তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারার আগেই সাহিত্য সমালোচনার কাজটি শুরু করে দিয়েছে। সত্যিকার অর্থে নারীবাদী তত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়সম্পূর্ণ সাহিত্যতত্ত্ব কখনোই উপহার দিতে পারেনি, যেমনটা পেরেছে ফরমালিজম বা স্ট্রাকচারালিজম। ফলে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় আমাদেরকে শুধু অবলোকন করতে হবে নারীবাদ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে নারীবাদী তত্ত্বের গ্রন্থসমূহ তাদের প্রতিপাদ্যের সপক্ষে বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যকর্মকে কীভাবে ব্যবহার করেছে এবং সাহিত্যকর্মের সাথে নারীর সম্পর্ককে কীভাবে বিশ্লেষণ করেছে।

নারীবাদ কোনো স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যতত্ত্ব উপহার দিতে না পারলেও নারীবাদী তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিকাশে সর্বযুগেই সাহিত্যের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। নারীবাদের যে তাত্ত্বিক ভিত্তি ও শক্তি তার একটি বড় অংশ দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন যুগে নারী বলতে যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বোঝানো হয়েছে তার ওপর। আর সেই বৈশিষ্ট্যসমূহকে নারীবাদীরা প্রামাণ্য করে তুলেছেন বিভিন্ন যুগের সাহিত্যকর্মে উপস্থাপিত নারীচরিত্রদের দ্বারা। নারীবাদীরা যেমন বলেছেন যে, উনবিংশ শতকে নারীরা ছিল সমাজে পেশাহীন এক শ্রেণির মানুষ। তাদের এই বক্তব্যের প্রমাণ হলো উনবিংশ শতকের ইউরোপিয় উপন্যাস যেখানে কোনো নারীকে জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো কাজ করতে দেখা যায় না।

তাই আধুনিক নারীবাদের অভ্যুদয়ের পরেও সত্তুর দশকে নারীবাদীদের সাহিত্য আলোচনায় সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকতো সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্মটিতে দৃশ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সকল আচরণের উদাহরণগুলো জড়ো করা আর বিশ্লেষণ করে দেখানো যে, উক্ত পিতৃতান্ত্রিক আচরণগুলো নারীর জীবনকে কতটা দুর্দশাময় করে রেখেছে। সাহিত্যকর্ম থেকে উদাহরণ জড়ো করে দেখানোর চেষ্টা করা হতো পিতৃতন্ত্র সমাজে স্থায়ী করে দিয়েছে এমন একটি মানসভঙ্গি (mind-set) যা সমাজে নারীর জেন্ডারভিত্তিক অসমতার পক্ষে স্থায়ীভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আশির দশকে এসে নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনার পরিসর আরো প্রসারিত হলো। নারীবাদীরা অন্যান্য সাহিত্যতত্ত্বকেও নারীবাদী সাহিত্য আলোচনায় টেনে আনতে শুরু করলো। নারীবাদ সেগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করলো মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব। মার্কসীয় তত্ত্বকে সাথে নিয়ে নারীবাদ এবার সাহিত্যকর্মের আলোচনায় দেখাতে শুরু করলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগের অভাবে সমাজের ক্ষমতাবলয়ে নারীর প্রবেশাধিকারও মিলছে না, আর ফলস্বরূপ সমাজে তার নিগ্রহের অবসানও ঘটছে না। এর মধ্য দিয়ে নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনা শুধু পিতৃতন্ত্র ও পুরুষতন্ত্রকে শাপশাপান্ত করনের একঘেয়ে কর্মকাণ্ড থেকে কিছুটা সরে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনার পরিসরে আরা প্রবেশ করলো কাঠামোবাদ, সাইকোএ্যানালাইটিকাল থিয়রি ইত্যাদি। এসবের সাথে আশির দশক থেকে নারীবাদ নিজেই একটি সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার মানসে নারীদের সাহিত্যকর্মের কিছু বুনিয়াদি কানুন নির্মাণেরও প্রয়াস পেলো যাতে ইতিহাসের অবহেলিত নারীলেখককুলের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 'গাইনোক্রিটিসিজম' নামে এর একটা নামকরণও প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এই প্রয়াসে ইলেইন শোঅল্টার (Elaine Showalter) বললেন যে, নারীবাদী সাহিত্য আলোচনা এবার এ্যান্ড্রোটেক্সট (পুরুষদের সাহিত্যকর্ম) থেকে গাইনোটেক্সটের (নারীদের সাহিত্যকর্ম) দিকে মুখ ঘুরিয়েছে।

গাইনেটেক্সট ও গাইনোক্রিটিসিজমের অস্তিত্ব ও সম্ভাবনার বিষয়ে একটি বড় প্রশ্ন হলো নারীদের লেখালেখির জন্য উপযুক্ত একটি ভাষার বিষয়। ভার্জিনিয়া উলফ নিশ্চয়তার সাথে বলেছেন নারীরা লিখতে গিয়ে ভয়ঙ্করভাবে যে সমস্যাটির সম্মুখীন হলো তা হলো তারা দেখলো যে তাদের লেখার জন্য কোনো ভাষাই তৈরি নেই। পুরুষরা এতকাল লিখে লিখে যে ভাষাটি নির্মাণ করেছে সেটি একেবারেই পুরুষদের ভাষা, নারীর লেখার ভাষা সেটি হওয়ার নয়। সান্দ্রা গিলবার্ট এবং সুসান গুবার নারীর ভাষা বলতে আলাদা কোনো ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও, হেলেন সিকশু এমন ভাষা এবং সেই ভাষায় নারীর লেখার বিষয়টি এত জোরের সাথে বলেছেন যে, সেই ভাষায় নারীর লেখালেখির তিনি নামই দিয়েছেন 'এক্রিতুরে ফেমিনিন' (ecriture feminine)।

নারীবাদ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনায় যে কাজগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলো একত্র করে নিম্নরূপ একটি তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

ক) পুরুষ ও নারী লেখকদের লেখায় নারীর চিত্রায়নকে সমালোচকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ।

খ) কোনো সাহিত্যকর্মে নারীকে 'অন্য' (Other) হিসেবে চিত্রায়ন করা হলে সাহিত্যকর্মটির বা সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কঠোর সমালোচনায় বিদ্ধ করা।

গ) সাহিত্যকর্মটিতে উপস্থাপিত সমাজের ক্ষমতাকাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখানো সেখানে নারীর অবস্থান কী। নারী সে ক্ষমতাকাঠামোতে অসাম্যের ও অমর্যাদার শিকার হলে সে অসাম্য ও অমর্যাদায় পিতৃতন্ত্র ও উৎপাদন কাঠামোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।

ঘ) সাহিত্যকর্মটিতে নারী কতখানি সমাজের তৈরি 'নারী', আর কতখানি শরীরবৃত্তীয় পরিচয়ে নারী তা নির্ণয় করা এবং সমাজের তৈরি 'নারী'দের ক্ষেত্রে সমাজের এই নারীকরণ প্রক্রিয়ায় ভাষার অবদান কতখানি তা নির্ধারণের চেষ্টা করা।

ঙ) সাহিত্যবিশ্লেষণের বিদ্যমান কানুন এ লক্ষ্যে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া যাতে অতীতে বিস্মৃত নারী লেখকদের পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং ইতিহাসে অবহেলিত নারী লেখককুল যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

চ) মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের নব প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ পরিচয়কে নতুন আলোকে বিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

ছ) নারী অভিজ্ঞতার নতুনতর মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

নারীবাদ স্বতন্ত্র কোনো সাহিত্যতত্ত্ব প্রদান না করলেও নারীবাদ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে নারীবাদীরা সাহিত্যসমালোচনায় উপরের কার্যপ্রক্রিয়া বা কার্যক্রমগুলো গুরুত্বের সাথে সম্পাদনের প্রয়াস পেয়েছেন। নারীবাদ, মার্কসবাদ কিংবা মনঃসমীক্ষণবাদ ইত্যাদির সাথে আধুনিকতাবাদ নামে আরো একটি ধারণা উনিশ শতকের শেষার্ধ বা বিশ শতকের শুরু থেকে উচ্চারিত হতে শুরু করলো। উত্তরকালে বিশেষ করে বিশ শতকের ষাটের দশকে এই আধুনিকতাবাদের ঔরসে জন্ম লাভ করলো আরো একটি নতুন তাত্ত্বিক ভাবনা যার নাম উত্তরাধুনিকতাবাদ। আমাদের এবারের আলোচনা সাহিত্যতত্ত্বের এই দুই বাপ-বেটাকে নিয়ে।

আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদ

নারীবাদ, মার্কসবাদ কিংবা মনঃসমীক্ষণবাদ ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন সময়বিন্দুতে যাত্রা শুরু করে এখনো ক্রিয়মান রয়েছে।